মানহাজের ব্যাপারে নির্দেশনা-০১

তুর্কি জিজ্ঞাসার জবাবে...

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবী রাহিমাহুল্লাহ

মানহাজের ব্যাপারে নির্দেশনা - ০১

তুর্কি জিজ্ঞাসার জবাবে...

মুল

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সালমান

আল হিকমাহ মিডিয়া

পূর্বকথা

তুরস্কের কিছু মুজাহিদিন ভাইয়ে প্রশ্নের জবাবে কায়েদাতুল জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ আলিম ও নেতা শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রাহিমাহুল্লাহ কুফর, তাকফির এবং ইরজা নিয়ে কায়েদাতুল জিহাদের আকিদাহ ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ১৪৩২ হিজরীতে আস-সাহাব মিডিয়া থেকে – ما ليس عنه انفكاك في أجوبة المجاهدين الأتراك– শিরোনামে এ আলোচনা প্রকাশিত হয়। বক্ষমান পুস্তিকাটি শাইখের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অনুবাদ। এই পুস্তিকাতে পাঠক নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কায়েদাতুল জিহাদের অবস্থান জানতে সক্ষম হবেন– ইমানের সংজ্ঞা, কুফর, ইরজা, ইরজার বিভিন্ন পুরাতন ও আধুনিক রূপ, সেনাবাহিনী ও এর সদস্যদের ব্যাপারে হুকুম, নির্বাচনে ভোটপ্রদান ও অংশগ্রহণ, নির্বাচনের ব্যাপারে 'মন্দের ভালো' নীতির প্রয়োগ এবং তাকফিরের ব্যাপারে মতপার্থক্য। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিদ্যমান বিভিন্ন ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তির নিরসনে এ আলোচনা অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই অনুবাদের মাধ্যমে আমরা ***'মানহাজের ব্যাপারে নির্দেশনা'*** সিরিজ সূচনা করছি, আলহামদুলিল্লাহি রব্বীল আলামীন। ইনশাআল্লাহ এই সিরিজে আমরা ধারাবাহিকভাবে আকিদাহ ও মানহাজের বিভিন্ন বিষয়ে কায়েদাতুল জিহাদের অবস্থানসমূহ তুলে ধরবো। বৈশ্বিক জিহাদের মানহাজকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও ধারণ করার ক্ষেত্রে এই সিরিজটি এ ভূখন্ডের মুজাহিদিন ও তাঁদের সমর্থকদের জন্য উপকারী হবে, বিইযনিল্লাহ।

আবু যুবাইদা

২৯ মুহররম, ১৪৪২ হিজরি

১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইংরেজি

লেখক পরিচিতি

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল লিবী। তিনি ছিলেন একাধারে একজন আলিম, মুজাহিদ, মুরাবিত, মুহাজির, কমান্ডার। ধৈর্যশীল, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আমীর। তাঁর মধ্যে উঁচু আখলাক ও পবিত্র চরিত্রের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন হকের দিকে আহ্বানকারী ও ইসলামের পতাকাতলে যুদ্ধরত বীর। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ মুহাক্কিক আলিম। তিনি শাইখ আবু আব্দুর রহমান জামাল বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন ইশিতিভী আল লিব্বী আল মিসরাতী। তিনি আতিয়াতুল্লাহ আল লিবি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মাওলা তাঁর মাঝে ইলম ও হিকমতকে একত্রিত করেছিলেন। প্রজ্ঞা, উত্তম নেতৃত্ব, সবর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুণ দান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ’র রণাঙ্গনগুলোর অর্পিত জিম্মাদারি ও জিহাদি সংগঠনের পরিচালনার ব্যাপারে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শাহাদাতের আগ পর্যন্ত জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে অন্যান্য শাখার সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন, যা লোকদেরকে আশ্চর্যান্বিত করতো। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন। তাঁর হিজরত, জিহাদ, রিবাত, দ্বীনের পথে অবিচলতা, ইলম অন্বেষণ, ইলম ও ইলমের প্রচারে আত্মত্যাগের ভরপুর প্রতিদান দিন। তাঁকে শহীদদের কাতারে কবুল করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে তার আলোচনাকে সুউচ্চ করুন। এবং তাঁকে অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত করুন, পশ্চাৎগামীদের নয়। আমিন।

জন্ম ও বংশ

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মূল নাম, জামাল বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম বিন ইশিতিভী আল লিব্বী আল মিসরাতী। তিনি হিজরী ১৩৮৮ মোতাবেক ইংরেজি ১৯৬৯ সালে লিবিয়ার মিসরাতাহ’র যাওয়াবি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম ও প্রতিপালন হয়েছে একটি আদর্শ মুসলিম পরিবারে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। সদাচার ও উত্তম

আচরণের জন্যে তাঁরা সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তার বেশ কয়েকজন ভাই ছিলেন, যাদের মধ্যে বাশির ও হাসান ছিলেন তাঁর অগ্রজ। তাঁরাও উত্তম চরিত্র ও সদাচারে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মুহাম্মাদ নামে তার একজন ছোট ভাই ছিলেন, যার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিষয়টিও সমাজে স্বীকৃত ছিল।

খোরাসানে হিজরত

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবী যৌবনের প্রারম্ভে ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৯ ইংরেজিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে খুরাসানে হিজরত করেন। ইসলামাবাদ পৌঁছালে কমান্ডার ইউসুফ আল বুখারি ও ভাই আব্দুর রহমান হাত্তাম তাঁকে রিসিভ করে পেশাওয়ারে লিবিয়ান মুজাহিদদের মেহমানখানায় নিয়ে যান। সেখানেই তাকে আতিয়াতুল্লাহ নামটি দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে পাঠানো হয় আফগানিস্তানের খোস্তের নিকটবর্তী জাওয়ার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে। জাওয়ারে তিনি সামরিক ও শরঈ নানান বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর তাঁকে জালালাবাদের কামা অঞ্চলে গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে আসেন পেশাওয়ারে। পেশাওয়ারে ফেরার পর তিনি ও তার সাথীরা আনুষ্ঠানিকভাবে শাইখ উসামা বিন লাদেনের নেতৃত্ব মেনে জামাআত কায়িদাতুল জিহাদে যোগদান করেন। এর আগে তাঁরা আল জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আলমুকাতিলাহ'র সদস্য ছিলেন। এরপর থেকে শাইখের জীবনের নতুন পথচলা শুরু হয়। তিনি প্রথমবার আফগানিস্তানে থাকাকালেই বড় বড় অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে খোস্ত বিজয় অন্যতম। তিনি প্রথম থেকেই মর্টার চালনা এবং বোমা তৈরির কাজে পারদর্শী ছিলেন।

মৌরিতানিয়ায় ইলম অর্জন

সোভিয়েত বিরোধী জিহাদ চলার সময় আল কায়েদা নেতৃবৃন্দ যুবকদের একটি দলকে মৌরিতানিয়ায় ইলম অর্জনের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন শাইখ আতিয়াতুল্লাহ ও তার বন্ধু শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল লিবি। জিহাদের কাজকে পরিপূর্ণ শরিয়াহ'র উপরে চালানোর জন্য এই সিদ্ধান্তটি ছিল

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ’র জীবনেও এটি অনেক বড় এবং প্রভাবশালী ইলমি সফর ছিল।

জিহাদের ময়দানকে ইলম দ্বারা উপকৃত করার জন্য প্রেরিত এই যুবকেরা শানকিতের উলামাদের ইলম, তাকওয়া, যোগ্যতা ও উত্তম গুণাবলী দ্বারা তাঁরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নিয়েছিলেন। শাইখের সঙ্গী মৌরিতানিয়াতে অবস্থানকালে বিবাহিত হন। তারপর শাইখ আলজেরিয়ায় যান। আলজেরিয়াতে বিবাহিত হবার পর স্ত্রীসহ মৌরিতানিয়ায় ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে আফগানিস্তান বিজয় হয়, রুশ ভল্লুকরা চরমভাবে পরাজিত হয়। শাইখ উসামা সৌদিতে ফিরে যান তারপর সুদানে চলে যেতে বাধ্য হন। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ সুদানে জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের নেতৃবৃন্দের সাথে গিয়ে মিলিত হন।

আলজেরিয়ায় হিজরত

আলজেরিয়ায় জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৯৫ ইংরেজিতে শাইখ উসামা বিন লাদেনের নির্দেশে তিনি শিক্ষক এবং দায়িত্বশীল হিসেবে সেখানে হিজতর করেন। পূর্ণ তিন বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর আলজেরিয়ার জিহাদের অঙ্গনে যখন পদস্খলন (ফিতনা) দেখা দিল তখন শাইখ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। আলজেরিয়ার জিহাদের পদস্খলন ও বিচ্যুতি নিয়ে তিনি হিসাবাহ ফোরামে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার ও আত তাজরিবাতুল জাঝায়িরিয়্যাহ’তে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। শামের আবু যুবার গাজী সংকলিত আলমাজমুয়াতুল কামিলাহ’তেও এসেছে কিছু আলোচনা।

আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতার পর শাইখ মুজাহিদিনের উদ্দেশ্য তাঁর আলোচনায় বিশেষ ভাবে দুটি বিষয়ে জোর দিতে শুরু করলেন।

১। বিরোধপূর্ন বিষয়ে উত্তম আখলাক অবলম্বনের গুরুত্ব

২। তাকফিরের ক্ষেত্রে যুবকদের তাড়াহুড়া প্রবনতা দূর করা।

শাইখ দুটি বিষয়ে তারবিয়াহ দেওয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। তিনি তারবিয়াহ দেওয়াকে মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব মনে করতেন।

আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন

অতঃপর ১৪২০ হিজরি মোতাবেক ২০০০ ইংরেজি সালে তিনি আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময় তালিবান মুজাহিদদের ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কাবুলের 'আলমাদরাসাতুল আরাবিয়াহ'তে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে থাকতেই ১১ সেপ্টেম্বরের বরকতময় অপারেশন সংগঠিত হয়।

অতঃপর যখন ক্রুসেডররা আফগানিস্তানে দ্বিতীয়বারের মত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করলো, তখন শাইখ ও তার সাথীরা আফগানিস্তানের বিভিন্ন নিরাপদ অঞ্চলে ফিরে যান এবং দাওয়াত ও জিহাদের কাজ জারি রাখেন।

অতঃপর আমেরিকা যখন ইরাক আক্রমণ করলো, শাইখ উসামা তাঁকে ইরাকের মুজাহিদদের নেতৃত্বের জন্য পাঠালেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তার ইরাক প্রবেশ সহজ হল না। ফলে তিনি খোরাসানে ফিরে এলেন।

নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী

জিহাদি আন্দোলনের ব্যবস্থাপনায় শাইখের দক্ষতা সুপ্রসিদ্ধ। তিনি জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ করে দিতেন। রায় প্রদানে তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও শক্তিশালী। বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল অনুধাবনে গভীর অন্তঃদৃষ্টির অধিকারী। তার ব্যাপারে আমিরুল ইস্তিশহাদিয়্যিন শাইখ আবু মুসআব যারকাবি এক রিসালায় বলেছিলেন-

"আতিয়াতুল্লাহ'কে আহবান কর! কেননা যা বলা হবে, সে ব্যাপারে তিনি অধিক জ্ঞানী।"

মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে জিহাদি আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন, উপকৃত করেছেন। তিনি জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের নেতৃত্ব এমন পরিস্থিতিতে গ্রহণ করেন যখন পরিস্থিতিই তার মত একজন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষমান ছিল। শাহাদাতের আগ পর্যন্ত তিনি উত্তমভাবে জিহাদের ভূমিগুলোকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদি কাজের চাপে আগ্রহ থাকলেও সে সময় অধ্যায়ন ও লেখালেখিতে সময় দিতে পারেননি। এ কারণে সে সময় তার ইলমি প্রকাশনাগুলো কমে গিয়েছিল। তিনি সময় স্বল্পতার কারণে অধ্যায়নে যথেষ্ট সময় দিতে না পারা নিয়ে আফসোস করতেন।

কিন্তু আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি । শাইখ এমন কিছু সুউচ্চ হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তিত্বকে রেখে গিয়েছেন, যারা বড় বড় উদ্ধতদের ধ্বংস করতে আঘাত করে যাচ্ছেন। আমরা দুয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে প্রতিরক্ষা করেন। মুবারক জিহাদের সফরকে পূর্ণ করা ও ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করতে সাহায্য করেন।

তিনি সাথী ভাইদের এবং তাদের সন্তানদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। ফলে তিনি ভাইদেরকে এমন অনেক কাজের ব্যাপারে নিষেধ করতেন, যা বাহ্যিকভাবে ভালো মনে হত, কিন্তু পরবর্তীতে চিন্তা ফিকির করে দেখা যেত, তিনি যা বলেছেন, সেটাই সঠিক। তার এই আগ্রহের মূল ছিল ভাইদেরকে রক্ষা করার জন্য, বিশেষ করে নেতৃবৃন্দ ও উচ্চপদস্থদের।

আল কায়েদা সংগঠনে শাইখের অবস্থান

শাইখ মুস্তাফা আবুল ইয়াজিদ আফগানিস্তানে আল কায়েদার মাসুলে আম (কেন্দ্রীয় প্রধান দায়িত্বশীল) থাকাকালে তিনি শাইখ মুস্তাফার নায়েবে মাসুল (কেন্দ্রীয় সহকারী দায়িত্বশীল) পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর শাইখের শাহাদাতের পর মাসুলে আম পদে অধিষ্ঠিত হন।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন শাইখ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ তখন আল কায়েদার দ্বিতীয় শীর্ষ দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত হন ।

জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রকাশিত অনেক বার্তা লেখায় তিনি শরীক ছিলেন। যার মধ্যে রয়েছে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ’র শাহাদাতের পর প্রদত্ত عِشْتَ حَمِيدًا.. بَيَانٌ بِشَأْنِ مَلْحَمَةِ الإِبَاءِ، وَاسْتِشْهَادِ أَسَدِ الإِسْلَامِ الشَّيْخِ أُسَامَةَ بْنِ لَادِنٍ নামক বার্তা ও শাইখ আবু দুজানা আল খোরাসানী রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত শহীদি হামলার পর প্রদত্ত غَزْوَةِ أَبِي دُجَانَةَ الخُرَاسَانِي تَقَبَّلَهُ اللهُ لِاخْتِرَاقِ حُصُونِ الأَمْرِيكَانِ নামক বার্তা।

গাযওয়াতুল খোস্ত

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ ছিলেন গাযওয়ায়ে হুজাইফা বিন ইয়ামান তথা গাযওয়া খোস্তের (২০০৯ ইংরেজির বিখ্যাত ক্যাম্প চ্যাপম্যান হামলা) মূল পরিকল্পনাকারী। এই হামলা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং মার্কিন সরকাকে প্রকম্পিত করেছিলো। এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন আবু দুজানা খোরাসানী (হুমাম খালিল আল-বালাবী) রহ.। শাইখ মুজাহিদ আবুল বারা কুয়েতী রহ. শাইখ আতিয়্যাহ রহ.এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন হামলার দ্বিতীয় দিন সকালে আমি শাইখের সাথে একজায়গায় দেখা করলাম। তার সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছিলাম। তিনি বললেন আবুল বারা তুমি জান কে এই হামলা করেছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন আমাদের আবু দুজানা খোরাসানী করেছে। তারপর কিভাবে এ হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, ও বাস্তবায়ন হয়েছে, তা তিনি আমাকে বিস্তারিত জানালেন।

অপারেশনের ব্যাপারে শাইখের বিস্তারিত জানা তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা এবং পরিকল্পনা ও পরিচালনার দক্ষতা প্রমাণ করে। প্রথমত আল্লাহর তৌফিকে। তারপর শাইখের পরিকল্পনা ও এবং আবু দুজানা খুরাসানীর ওয়সিলায় এই কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

এই হামলা মার্কিন গোয়েন্দাবাহীনির জন্য বড় ধরণের আঘাত ছিল। তাদের বড় ৭ জন ইন্টেলিজেন্স অফিসার (এবং জর্ডানের গোয়েন্দা বাহিনীর এক অফিসার) এই এক হামলায় নিহত হয়।

দ্বীনের পথে অটল অবিচলতার দৃষ্টান্ত

শাইখের সন্তান ইবরাহীম শাইখ আবুল লাইস আল লিবির সাথে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আর শাইখের সাথে শহিদ হয়েছেন তাঁর আরেক সন্তান ইসাম। তাঁর আরেক পুত্র আবদুর রহমান জীবিত আছেন।

তার ছেলে ইবরাহীমের শাহাদাতের ঘটনা জানার পর শাইখের প্রতিক্রিয়া থেকে তাঁর সাবর, তাওয়াক্কুল এবং দ্বীনের পথে অবিচলতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শাইখ আতিয়াতুল্লাহকে কিভাবে তার সন্তানের শাহাদাতের খবর জানাবেন, তা নিয়ে তাঁর সাথী শাইখ আব্দুল্লাহ সাঈদ আল লিবি পেরেশান

হচ্ছিলেন। শাইখের সাথে দেখা করার পর তিনি বিমান হামলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ বিমান হামলাতে শাইখের ছেলে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু শাইখ আব্দুল্লাহ সাইদ আল লিবি কোন জবাব দিলেন না, বরং শাইখ আতিয়াতুল্লাহর সাথে অন্যান্য আমলে শরীক হতে লাগলেন! তারপর শাইখ আতিয়াতুল্লাহ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন

"আপনি আমাকে বলুন, বিমান হামলায় কি আমার ছেলে নিহত হয়েছে?"

শাইখ আব্দুল্লাহ তখন বিষয়টি জানালেন। ছেলের শাহাদাতের খবর শোনার পর, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ 'ইন্নালিল্লাহ' পড়লেন, সালাতে দাড়িয়ে গেলেন এবং দুই রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর শাইখ আব্দুল্লা সাঈদ আল লিবির কাছে ফিরে এসে বললেন

"তাহলে আসুন আমরা আমাদের অবশিষ্ট আমাল ও কাজগুলো সম্পন্ন করে ফেলি!।"

তিনি দীর্ঘ সময়জুড়ে আলজেরিয়া, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান জিহাদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে চষে বেড়ান। অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফিকহুল জিহাদ এবং 'ফিকহুল ওয়াকী' তে ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্ব। জিহাদের ময়দানে, মুজাহিদদের মাঝে আভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণ উদঘাটন এবং তাঁর সমাধান বিধানে তাঁর ফয়সালা ছিল সঠিক ও অত্যন্ত কার্যকরী।

শাহাদাত

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল লিবি ছিলেন একজন শাহাদাত পিয়াসী ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ জিহাদি জীবনের এক পর্যায়ে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভ করেন। শাইখ ১৪৩২ হিজরীর রমজানের শেষ দশকের ২৩ ই রমজান মোতাবেক ২০১১ ইং সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান এর মিরান শাহ অঞ্চলে আমেরিকান ড্রোন বিমান হামলায় শাহাদতের সুধা পান করেন। সারা জীবন আল্লাহর যমীনে হিজরত ও জিহাদে কাটানো এই বান্দা সেইদিন দুনিয়া ত্যাগ করে রাব্বে কারীমের দিকে হিজরতে চলে যান।

আল্লাহ তায়ালা শাইখকে কবুল করুণ। জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুণ। শাহাদাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর।

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লিব্বী এবং তাঁর বন্ধু শাইখ আবু ইয়াহইয়া লিব্বী (রাহিঃ) ইলম এবং ফিকহের দরস বা শিক্ষা দিতেন। শাইখ উম্মাহর জন্য অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কিতাব রচনা করেন। তাঁর সাথে রয়েছে অনেকগুলো অডিও এবং ভিডিও ভাষণ। জিহাদের পথের পথিক ও ছাত্রদের জন্য এ আলোচনা ও রচনাগুলো উপকারী ইলম ও ফিকিরে সমৃদ্ধ এক অমূল্য রত্নভান্ডার।

তিনি ছিলেন একজন মুখলিস, চৌকস ও নিভৃতচারী মুজাহিদ, যার শাহাদাতের কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও তার প্রকৃত নামটিও বিশ্ববাসী জানতো না। লিবিয়ায় যখন বিপ্লব শুরু হয়ে গেল, তখন জিহাদ ও মুজাহিদদের স্বার্থে তিনি নিজের প্রকৃত নাম প্রকাশ করেছিলেন। জিহাদের রনাঙ্গনগুলোতে তিনি পরিচিত ছিলেন আবু উসামা আল লিবি, মাহমুদ হাসান, মাহমুদ, আব্দুর রহমান ও আবদুল কারিম আল লিবি নামে। শাইখ আতিয়াতুল্ল ছিলেন একাধারে একজন আলিম, মুজাহিদ, মুরাবিত, মুহাজির ও কমান্ডার। তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ও চরিত্রবান সেনাপতি ও আমীর। তার রচনাবলী শামের আবু যুবাইর আল গাজী কর্তৃক সংকলিত “আলমাজমুয়াতুল কামিলাহ” নামে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত উপকারী এ সংকলনের মুখবন্ধ লিখেছেন শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিযাহুল্লাহ।

সূচীপত্র

পূর্বকথা ৩

লেখক পরিচিতি.. ৪

প্রশ্ন ১৪

উত্তর..১৬

ভূমিকা ১৬

আকিদাহর ইলম ও এর প্রকারভেদ ২১

প্রশ্নের জবাব ২৫

আকিদাহ অধ্যায়নের গুরুত্ব ও এর উদ্দেশ্য...২৯

তাকওয়া অর্জনে করণীয় ৩৩

ইরজা ৩৫

ইরজা’র বিভিন্ন প্রকার ৩৬

ইরজা’র আধুনিক রূপ...৩৮

আহলুস সুন্নাহর আকিদাহ... ৪০

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা...৪১

তাকফির..৪২

তাকফিরের মাসআলায় বক্তব্য ৪৪

প্রথম কথা: ৪৪

দ্বিতীয় কথা: ৪৪

তৃতীয় কথা: ৪৫

চতুর্থ কথা: ৪৭

পঞ্চম কথা: ৪৭

তাকফিরের বিভিন্ন স্তর ৪৭

তুরস্কের প্রেক্ষাপট ৪৯

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আযিযের “আল-জামী” কিতাবের ব্যাপারে........৫১

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসীর রচনাবলীর ব্যাপারে................................৫২
নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর.. ৫৩
'মন্দের ভালো' নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে... ৫৩
তুরস্ক ও এমন অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার হুকুম ৫৫
সেনাবাহিনীগুলো কি দলগতভাবে মুরতাদ নাকি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলে মুরতাদ? ৫৭
এসব দল শুধু দলগতভাবে মুরতাদ না-কি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলেই মুরতাদ? ৫৭
তুর্কি জনগণের ব্যাপারে ৫৮
তুরস্কের উলামায়ে কেরাম ও জনগণের প্রতি নসীহত......................................৫৯
শাইখ আল-মাকদিসীর বক্তব্যের ব্যাপারে মন্তব্য ৬২
উপসংহার ৬৩

প্রশ্ন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। সম্মানিত শাইখদের নিকট (আল্লাহ তাদের সকলকে অবিচল রাখুন!) জিজ্ঞাসা:

আপনাদের অবগতির জন্য বিনীতভাবে জানাচ্ছি, তাকফিরের মাসআলায় তুরস্কের জামাতগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে:

১. একদল তাকফিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বিশেষ করে শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ এবং শাইখ আবু মুহাম্মদ মাকদিসী (আল্লাহ উভয়কে সত্য পথে অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন)—এদুজন শাইখের বক্তব্য ও কিতাবাদির প্রসারের পর।

২. আবার কেউ কেউ এখন পর্যন্ত নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করছে এবং সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকেও ফিরে আসছে না।

৩. আবার কেউ কেউ উপরিউক্ত দুইদলের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছে।

আমাদের এ দেশের অবস্থা হচ্ছে, অনেকেই মনে করে, তানজিম 'কায়িদাতুল জিহাদ' -এর মানহাজ হচ্ছে ঠিক ঐ সমস্ত লোকদের মতো, যারা তাকফিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আবার অনেকে মনে করছে, তানজিমের মানহাজে 'ইরজা'-এর দোষ রয়েছে। আমরা আশা করবো, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে আপনারা এজাতীয় অস্পষ্টতা ও বোঝার ভুলগুলোকে দূর করে দেবেন!

- তানজিমের (অর্থাৎ কায়েদাতুল জিহাদ-এর) আকিদাহ কী?
- তাকফির-এর মাসআলায় আপনাদের বক্তব্য কী?
- তুর্কি জনসাধারণকে আপনারা কীভাবে দেখেন?
- তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম এবং জনসাধারণের প্রতি আপনাদের নসিহা কী?
- “আররিসালাতুস সালাসিনিয়্যাহ” গ্রন্থে সংসদীয় নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারীদেরকে কোন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (তাফসিল)

ব্যতিরেকে আমভাবে তাকফিরের মাসআলায় বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক করে শাইখ আবু মোহাম্মদ মাকদিসী হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন –

> *“এ কারণে হুজ্জত কায়েম করার আগে এবং সংসদ সদস্যদের কাজের প্রকৃতি এবং এগুলো যে দ্বীন ইসলাম ও রাব্বুল আলামিনের তাওহিদের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক, এ বিষয়গুলো তাদেরকে জানানোর আগে তাদেরকে তাকফির করা হালাল হবে না। এরপরেও যদি তারা তাদেরকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে অনড় থাকে তখন তাদেরকে তাকফির করা হবে।”*

উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কী?

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান!

প্রশ্নটি করেছেন – আবু সালে আত-তুর্কি

উত্তর

ভূমিকা

তাওফিক একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله المصطفى وآله وصحبه ومن لنهجهم قفا.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং তিনি যথেষ্ট! সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও নির্বাচিত রাসূল ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর, তাঁর সাথীবর্গের ওপর এবং যারা তাদের পথে চলবে তাদের সকলের ওপর!

হামদ ও সালাতের পর -

প্রিয় ভাইদের জ্ঞাতার্থে বলছি, ঈমান, সঠিক পথ, তাকওয়া ও পূণ্যময় কাজের জন্য হেদায়াত ও তাওফিক একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর মালিকানাধীন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের দয়া, কৃপা ও অনুগ্রহ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে এ থেকে বঞ্চিত করেন। তাইতো নবী মুহাম্মাদ ﷺ সৃষ্টিকুলের মাঝে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা তাঁকে বলছেন:

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

তরজমা: আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'য়ালাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (সূরা কাসাস: ৫৬)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন:

فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ

তরজমা: আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েত দেয়ার কে আছে? (সূরা রুম: ২৯)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هدىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

তরজমা: আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন [তাকে পথ দেখানো হয় না] এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা আন নাহল: ৩৭)

ইমামুল কিরাত নাফে'- সহ অন্যান্যদের মতে يهدى মাজহুল হবে। [এটি আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটি পরিভাষা, যার বিপরীত হচ্ছে মারুফ। অর্থাৎ يهدى মারুফ ও মাজহুল দুইভাবেই পড়া যাবে।]

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

তরজমা: এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা যুমার: ২৩)

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ – وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ

তরজমা: আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। (সূরা যুমার: ৩৬, ৩৭)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ – وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

তরজমা: আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতো সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য? আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর। (সূরা ইউনুস: ৯৯, ১০০)

وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তরজমা: আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সেজদা: ১৩)

কোরআনে এমন বহু আয়াত রয়েছে। যেসব বিষয় বিশ্বাস করা, স্বীকারোক্তি দেওয়া এবং আল্লাহ জাল্লা ও'য়ালার ব্যাপারে যেসব বিষয়ে অন্তরে স্থির ধারণা পোষণ করা সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য, এটি তেমনি একটি বিষয়। বান্দা যখন এই বিষয়গুলো পালন করবে, তখন তার এসব সুদৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাসের দাবি এটাই হবে, সে যেন তার মাওলা পাকের প্রতি মনোনিবেশ করে, হেদায়াতের আশায় তার কাছেই ফেরে, ব্যাকুল হয়ে তার কাছে হেদায়েত কামনা করে এবং অবিরত তার রহমতের দুয়ারে করাঘাত করতে থাকে।

একই সঙ্গে সে যেন ভীতসন্ত্রস্ত এবং বিনয়ী হয়। নিজের অক্ষমতা, দারিদ্র্য, দুর্বলতা, নিজের জুলুম-অত্যাচার আল্লাহর সামনে পেশ করে। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার এই উক্তি যেন সে স্মরণ করে:

"হে আমার বান্দারা! তোমরা প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট কেবল ওই ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আমি হেদায়েত দান করি। অতএব তোমরা আমার কাছে হেদায়েত কামনা করো, আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করব।"

আর মুখে হেদায়েত কামনা করার চাইতে নিজের অবস্থার দ্বারা হেদায়েতের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর কাছে প্রকাশ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বান্দা এভাবে বলবে: হে আল্লাহ যদি তুমি আমাকে হেদায়েত দান না করো তবে কে আমাকে হেদায়েত দেবে? যদি তোমার রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে না নাও, যদি তোমার অনুগ্রহের চাদরে আমাকে জড়িয়ে না নাও, যদি হেদায়েতের নেয়ামত আমাকে দান না করো, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব! আমিতো ধ্বংস হয়ে যাব!

অতঃপর যে মুমিন বান্দাকে আল্লাহ তা'য়ালা হেদায়েতের প্রাথমিক স্তরে উপনীত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন, তাকে জানতে হবে যে, হেদায়াতের অনেক পর্যায় ও স্তর রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

তরজমা: যারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের সৎপথ প্রাপ্তি আরো বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন (সূরা মুহাম্মদ: ১৭)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

তরজমা: যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথ প্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন। (সূরা মারইয়াম: ৭৬)

একারণেই আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা আমাদের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন, যেন আমরা প্রতিদিন কয়েকবার তাঁর কাছে হেদায়েত কামনা করি। আর এটি হচ্ছে এমন একটি দোয়া, যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। তাইতো আল্লাহ তা'আলা আমাদের সালাতগুলোতে সুরা ফাতিহা পাঠ করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন আর তাতে রয়েছে এই আয়াত:

اهدنا الصراط المستقيم

তরজমা: তুমি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল পথের দিশা দান করো

এই আয়াতটি সুরা ফাতেহার মূল অংশ। কারণ এর আগের আয়াতগুলো হচ্ছে ভূমিকা ও সূচনাস্বরূপ। সেখানে আল্লাহর হামদ, সানা, মহিমা ব্যঞ্জনা অতঃপর সবিনয় প্রার্থনা এসেছে। আর এই আয়াতের পরের আয়াতগুলোতে সীরাতে মুস্তাকিমের অর্থ ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে এই দোয়ার পরিশিষ্ট আনা হয়েছে। সেখানে আল্লাহর নির্বাচিত পূণ্যবান যেসব বান্দাদেরকে তিনি হেদায়েত দান করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদেরকে তিনি সাফল্য দান করেছেন, তাদের ওপর তাঁর নেয়ামত বর্ষণের আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণরূপে হেদায়েত লাভের কিছু মাধ্যম রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাওফিক এবং তার প্রতি মনোনিবেশের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, বিশুদ্ধ পন্থায় সৎ উদ্দেশ্যে উপকারী ইলম অর্জন করা এবং দ্বীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান লাভ করা; কল্যাণ প্রত্যাশী হওয়া এবং সর্বদা উত্তম থাকতে চেষ্টা করা। এমনিভাবে মহা মহিয়ান আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা এবং এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি দ্বীনকে সহজ-সরল করে দিয়েছেন যেমনটি তিনি এরশাদ করছেন:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

তরজমা: আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না (সূরা বাকারা: ১৮৫)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

তরজমা: আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (সূরা ক্বামার: ১৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দ্বীন ও শরীয়তের শাখাগত বিষয়গুলোর সামষ্টিক বিবেচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দ্বীন খুবই সহজ-সরল, এতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা সাধ্যাতীত চাপের কিছুই নেই। না আছে কোন প্রকার জটিলতা, দুর্বোধ্যতা বা কৃত্রিমতা। তাইতো আল্লাহ আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা এরশাদ করেন:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُم

তরজমা: আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে অবশ্যই তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন (সূরা বাকারা: ২২০)

অর্থাৎ তিনি চাইলে তোমাদেরকে পেরেশানি ও সংকীর্ণতার মাঝে পতিত করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এমনটি করেননি। বরং তোমাদেরকে সহজতা দান করেছেন, তোমাদের জন্য সরলতা ও প্রশস্ততাকে পছন্দ করেছেন। এমনিভাবে নবীজি ﷺ এরশাদ করেছেন:

هلَكَ المتنطِّعون

“বাড়াবাড়ি করা লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে”

এটি তিনি তিনবার বলেছেন। ইমাম মুসলিম সহ অন্যান্য ইমামগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে বাড়াবাড়িকারী বলতে বোঝানো হয়েছে ওই সমস্ত লোকদেরকে, যারা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং কথা ও কাজের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে। এমনিভাবে যারা দার্শনিকদের পন্থায় সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয় নিয়ে পড়ে থাকে।

অতএব মুমিন বান্দার এই স্থির বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যে, এই দ্বীন ও আকিদাহ আল্লাহর রহমতে খুবই সহজ ও সরল। ইলমুল কালামের লোকেরা এবং শরীয়তের পথ থেকে বিচ্যুত, শরীয়তের ব্যাপারে উদাস, অতীত ও বর্তমানের ভ্রান্ত

দার্শনিকেরা (ফালাসাফা) দ্বীনকে যেভাবে কঠিন করে উপস্থাপন করেছে, তেমনটা নয়।

অতএব আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলার (মহিমাময় যার নাম সমূহ) ব্যাপারে, তাঁর ফেরেশতাদের ব্যাপারে, তাঁর রাসুলগণের ব্যাপারে, তাঁর কিতাবসমূহ, দ্বীন ও শরীয়তের ব্যাপারে, অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তথা আখিরাতের সমস্ত গায়েবী বিষয়সমূহের ব্যাপারে, আল্লাহর সমস্ত মাখলুক এবং সেগুলোর মধ্যে আনুগত্যশীল ও অবাধ্য মাখলুকগুলোর মাঝে স্তরবিন্যাসের ব্যাপারে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কর্তৃক লিখিত তাকদীরের ব্যাপারে আমাদেরকে অনিবার্যভাবে কী আকিদাহ পোষণ করতে হবে, তার সবকিছুই কিতাব ও সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে— সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আকারে।

এখন সংক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলো যে ব্যক্তি পুরোপুরি ভাবে মেনে নিয়েছে, আল্লাহর রহমতে সে নাজাতপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে যে ব্যক্তি বিস্তারিতভাবে এগুলোর জ্ঞান অর্জন করেছে, সে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদেশের অনুগত বান্দাদের মধ্যে যাকে যতটুকু ইলম, মারেফত ও তার প্রতি আনুগত্য এবং সৎকাজের তাওফিক দান করবেন, সে শরীয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে ততটা জানতে পারবে।

আকিদাহর ইলম ও এর প্রকারভেদ

এখন কথা হল, আকিদাহ-বিশ্বাসের শাখাগত বিষয়াদি যেগুলোর জ্ঞান অর্জন করা এবং যেগুলো জানার জন্য সচেষ্ট হওয়া মুমিন বান্দার জন্য ওয়াজিব, সেগুলোর সুনির্দিষ্ট পরিচয় ও পরিসীমা কী?

এটি আসলে এমন একটি মাসআলা, অল্প কথায় যার অকাট্য যুৎসই সমাধান করা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ আল্লাহই সর্বজ্ঞ! তবে আমরা মোটাদাগে কিছু সূত্র উল্লেখ করতে পারি, যা মূল বিষয় বুঝতে সহায়তা করবে। সে লক্ষ্যে আমরা বলতে চাই:

◌ আমরা সকলেই জানি, এককথায় উপকারী ইলম বলা হয় ঐ ইলমকে: যে ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক, আর এই ইলমকেই ফরজে আইন ইলম বলে। আবার ইলমের মাঝে কিছু অংশ রয়েছে যা ফরজে কিফায়া। ওলামায়ে কেরাম রাহিমাহুমুল্লাহ এগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যে ইলম অর্জন

করা ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক, তা এমন ইলম হতে হবে, যা অর্জন করা ছাড়া ইসলাম ও ঈমান বিশুদ্ধ হয় না। যার ওপর ইসলামের সব আবশ্যিক দায়িত্ব পালন এবং সর্বপ্রকার আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে। শরীয়ত তাফাক্কুহ ফিদ্দীন (দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করা।) অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আর আল্লাহর দ্বীনের মাঝে অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয় হচ্ছে, আকিদাহ, ঈমান ও তাওহিদের বিষয়টি। কামালত অর্জনকারী কলব (আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী অন্তর।) ইলম অর্জনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে বিশেষ করে ইলমে আকিদাহ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:

> *"যার অন্তরে ইলমের প্রতি সামান্য আগ্রহ, ভালোবাসা অথবা ইবাদতের প্রবল ইচ্ছা রয়েছে, তার জন্য এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং এক্ষেত্রে সত্য উদ্ঘাটন করে তা উপলব্ধি করা জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ও মাকসাদ। এখানে আমি সেসব বিষয় বোঝাতে চাচ্ছি, আকিদাহ হিসেবে যেগুলোকে অন্তরে স্থান দেয়া জরুরী। মহান রব ও তাঁর সিফাতের কাইফিয়াত জানার কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। যাই হোক, বিশুদ্ধ মনের কেউ উপরোক্ত জরুরী বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে অন্য কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না।"*

◌ এতে কোন সন্দেহ নেই, আকিদাহ সংক্রান্ত এমন কিছু মাসআলা রয়েছে, যেগুলো জানা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সে বিষয়ে জানে না তার জন্য তা জানা একান্ত জরুরী। সেগুলো এমন বিষয়, যেগুলোর দ্বারা ঈমানে মুজমাল (অর্থাৎ ঈমান তথা বিশ্বাস এবং ইসলাম তথা আনুগত্যের মোদ্দা কথা।) অর্জিত হয় এবং নিফাক বা কপট ঈমান থেকে মুক্তি লাভ হয়। পূর্বে আমি এমনটি ইশারা করেছি। এ বিষয়ে শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ 'উসূলুস সালাসা' পুস্তিকাটি রচনা করেছেন এবং তাতে বলেছেন:

> *"প্রকাশ থাকে যে—আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন—মুসলমান প্রতিটি নারী-পুরুষের ওপর এই তিনটি মূলনীতি জানা এবং এগুলোর উপর আমল করা ওয়াজিব"*

অতঃপর তিনি সেগুলো বর্ণনা করে বলেন:

“অতএব এখন যদি বলা হয়, সেই তিনটি মূলনীতি কী যেগুলো জানা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব? তখন বলতে হবে, বান্দার জন্য তার রবের ইলম অর্জন করা, তার রবের দ্বীন সম্পর্কে জানা এবং তার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিচয় লাভ করা।”

শাইখের বক্তব্য দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো, মোটাদাগে এ তিনটি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ

তরজমা: জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ক্রটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (সূরা মুহাম্মদ: ১৯)

আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা আরো ইরশাদ করেন:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

তরজমা: কসম যুগের! (সময়ের) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত! কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। (সূরা আল আসর)

যে সকল বিষয় ব্যক্তির ঈমানের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়; যেগুলো ঈমানকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহপাকের তাওহিদ, তাঁর তাজিম ও সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি, ক্রুটি-বিচ্যুতি, পদস্খলন ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে হেফাজত করে–নিঃসন্দেহে তেমন প্রতিটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন মুমিন বান্দার একান্তই কাম্য এবং এই ইলম অর্জন কখনো মুস্তাহাব থাকে আবার কখনো ওয়াজিব হয়ে যায়।

অতএব মুসলিম ব্যক্তি ইলমে তাওহিদ, ইলমে আকিদাহ ও ইলমে ঈমান অর্জন করবে কয়েকটি উদ্দেশ্যে:

নিজের আকিদাহকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। কারণ আকিদাহর কারণে আমল বিশুদ্ধ হয়, ঈমান বিশুদ্ধ হয় এবং বৃদ্ধি লাভ করে। তাওহিদ আকিদাহ ও ঈমানের পাঠ

সেজন্যই নেবে যাতে তাওহিদের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব সকল শাখা সে অর্জন করতে পারে এবং যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি, শিরক অথবা কুফর (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) থেকে সে নিরাপদে থাকতে পারে। একারণেই ওলামায়ে কেরামের মাঝে অনেকেই যখন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয়ের স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন তাওহিদ আকিদাহ্ সংক্রান্ত ইলম এবং ঈমানের মাসালাগুলোকে সর্বোত্তম ইলম ও শাস্ত্রীয় বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। আর এটি সঠিক হবার বিষয়টি স্পষ্ট। অতএব আকিদাহ ও তাওহিদ সংক্রান্ত শাখাগত বিষয়টির মাঝে কিছু আছে ওয়াজিব আবার কিছু আছে মুস্তাহাব।

◌ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাতিল আকিদাহ পোষণ করা জায়েজ নয় এবং সাধ্যমত নিষিদ্ধ বিষয় দূর করা ওয়াজিব। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এটির মাঝে তারতম্য হয়ে থাকে। সংশয়বাদী ব্যক্তি সে কখনোই ওই ব্যক্তির মতো নয় যার ঈমান নিরাপদ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি উচ্চস্তরের ইলম অর্জনের জন্য প্রস্তুত, ইলম অর্জন ও শিক্ষাদান, আল্লাহর পথে দাওয়াত ও নেতৃত্ব দান ইত্যাদি বিষয়ের জন্য উন্মোচিত করা হয়েছে, সে কখনোই সাধারণ অন্য কারো মতো নয়।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করি যেন তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের সকল ভাইকে হেদায়েত ও সঠিক পথ দান করেন আর আমাদেরকে সর্বপ্রকার ফিতনা ও বিভ্রান্তিকর বিষয় থেকে হেফাজত করেন!

"উপকারী কিতাব কোনগুলো?", এমন প্রশ্নকারী এক ব্যক্তির জবাবে শাইখ ইমাম তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:

> *"উম্মাহ ইলমের প্রতিটি শাখায় এবং সবকটি শাস্ত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত মেধা ব্যয় করেছে। এখন আল্লাহ যার অন্তরকে আলোকিত করতে চান, তাকে তন্মধ্যে উপকারী বিষয়গুলো চয়ন করার তৌফিক দান করেন। আর যাকে অন্ধ করেন, এত এত কিতাব তার জন্য পেরেশানি ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না। তাইতো নবীজি ﷺ লাবিদ আনসারীকে বলেছিলেন: 'ইহুদী-নাসারাদের কাছে কি তাওরাত এবং ইঞ্জিল নেই? এতে তাদের কি উপকার হয়েছে?'*

যাই হোক আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদেরকে হেদায়েত ও সঠিক পথের দিশা দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন, নফসের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন।

আমাদেরকে হেদায়েত দানের পর এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমতের ফয়সালা করার পর আমাদের অন্তরগুলো বক্র করে না দেন! নিশ্চয়ই তিনিই মহান দাতা।”

প্রশ্নের জবাব

আমি আশা করছি আমার লিখিত এই ভূমিকা সত্যকে পরিচয় করিয়ে দিতে সহায়ক হবে। এ পর্যায়ে আমি প্রশ্নের জবাব আরম্ভ করছি। আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমি বলতে চাই:

‘জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ’-এর পতাকাতলে সমবেত সকলেই আল্লাহ তাআলার রহমতে দ্বীন ইসলাম এবং তার চিরাচরিত আকিদাহ ও মানহাজের উপর ঐক্যবদ্ধ। আর তা হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা, ভক্তি-ভালোবাসা ও সম্মান সহকারে সেগুলো অনুসরণ করা। নবী আলাইহিস সালামের ফয়সালার অনুগত থাকা এবং তাঁর শরীয়ত ও শরীয়ত সমর্থকদের পক্ষে থাকা। আর এটাই হলো ঈমান ও ইসলাম। ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানের সিয়াম পালন করা এবং সাধ্য থাকলে বাইতুল্লাহ্'র হজ আদায় করা। আর ঈমানের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং ভালো-মন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

এবার আসি শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত আলোচনায়— সেগুলোর ব্যাপারে মানুষেরা বিভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসা করে থাকে। আমার মনে হয় প্রশ্নকারী এখানে সেগুলোর কথাই বলতে চাচ্ছেন।

মুসলিম উম্মাহর ভেতর আল্লাহর দ্বীন নিয়ে অনেক মতবিরোধ, মতানৈক্য এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার অনেক ঘটনা ঘটেছে। পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর ভেতরেও তাই ঘটেছিল। বস্তুত এটি উম্মাহর বিভক্তি প্রসঙ্গে সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী মুহাম্মদ ﷺ এর হাদিসের বাস্তবায়ন। হাদীসটিতে তিনি এরশাদ করেন:

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة" رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني

"ইহুদিরা একাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তন্মধ্যে কেবল একদল জান্নাতি আর অবশিষ্ট সত্তর দল জাহান্নামী। আর খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেগুলোর ভেতর একাত্তর দল জাহান্নামী কেবল একটি দল জান্নাতী। ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে কেবল একটি দল জান্নাতে যাবে আর ৭২ দল জাহান্নামে যাবে।

"বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল তারা কারা? তিনি বললেন: 'জামাআত'।

—হাদীসটি ইবনে মাজাহ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন এবং আল-আলবানী এটিকে সহিহ বলেছেন।

আল্লাহর প্রশংসা এবং শুকরিয়া! নিঃসন্দেহে আমরা আশা করছি এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করছি, যাতে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, পূর্বোক্ত হাদিসে যাদের বর্ণনা এসেছে— আর সেটি হচ্ছে জামাআত। এখানে জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উম্মাহর প্রথম জামাআত অর্থাৎ বিপথে যাবার আগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত জামাআত। আলেম সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু মহান তাবেঈ আমর ইবনে মাইমুন রহিমাহুল্লাহকে এমনটাই বলেছেন যে,

يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟ قلت لا، قال : إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.

"হে আমর ইবনে মাইমুন! আমি তো অত্র এলাকায় তোমাকে সবচেয়ে বড় ফকীহ মনে করতাম। তুমি কি জানো জামাআত কী?

"উত্তরে তাবেয়ী বলেন: না। তখন তিনি ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর জামাআত তো হলো সেটাই যা সত্যের অনুকূল হয় যদিও তাতে তুমি একাই হও না কেন।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: (তাবেয়ী বলেন) ইবনে মাসউদ আমার রানে চাপড় দিয়ে বললেন:

ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى.

তোমার জন্য আফসোস! নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর জামাআত হলো সেটাই যা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের অনুকূল হয়।”

নুয়াইম বিন হাম্মাদ বলেন:

إذا فسدت الجماعةُ فعليك بما كانت عليه الجماعةُ قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ.

“অর্থাৎ যখন জামাআত বিপথে চলে যাবে, তখন তোমার কর্তব্য হলো, বিপথে যাবার আগে জামাআতের যে আদর্শ ছিল তা আঁকড়ে ধরে থাকা। যদিও তুমি একাই হও তবুও নিঃসন্দেহে ওই সময়ে তুমিই জামাআত।

— ‘আল বা'য়েস 'আলা ইনকারিল বিদা'য়ি ওয়াল হাওয়াদিস’ গ্রন্থে ইবনে শাম্মা উক্তিটি উল্লেখ করেছেন। আর হাফেজ আবু বকর বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ তাআলা তার 'মাদখাল' গ্রন্থে উক্তিটি সংকলন করেছেন।

জামাআতের ব্যাখ্যা এভাবে এসেছে, জামাআত হচ্ছে সেটি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এই ব্যাখ্যাও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মারফু সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিআল্লাহু আনহুমার যে হাদীসটি ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, তাতে এমনটাই এসেছে যে,

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوَ النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمَّهُ علانيةً لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي”. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وصححه الشيخ الألباني وغيره.

“‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব ও সব্যাখ্যায়িত (মুফাস্‌রার)। এই সনদসূত্র ব্যতীত উপরোক্ত প্রকৃতির কোন বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের জানা নেই। শায়খ আল-আলবানি প্রমুখ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

তাইফা আল-মানসুরা; যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ দিয়েছেন, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার ব্যাপারে আশাবাদী এবং এর জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও প্রয়াস পেতে প্রস্তুত–সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস বিভিন্ন শব্দে মুতাওয়াতির (যুগ পরম্পরাগত) সূত্রে সহীহাইন, বিভিন্ন সুনান গ্রন্থ সহ বহু হাদিস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তেমনি একটি বর্ণনা রয়েছে সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে। হাদীসটি মারফু সূত্রে হযরত সাওবান রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন—

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

“নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা তাদেরকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহর নির্দেশের আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।”

আর মারফু সূত্রে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

“নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।”

আকিদাহ অধ্যায়নের গুরুত্ব ও এর উদ্দেশ্য

এবার আসি আকিদাহর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত বিষয়কে উম্মাহ অধ্যায়ভিত্তিক যেভাবে বিভক্ত করেছে এবং সুবিন্যস্তভাবে সবিস্তার লিপিবদ্ধ করেছে, তার আলোচনায়। তো এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব, নিঃসন্দেহে আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং আহলুল হাদীস আন নববী আশ শরীফ-এর মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত সাহাবীবর্গ ও হেদায়েতপ্রাপ্ত পুণ্যবান খলিফাদের সুন্নাহ অনুসরণ করে থাকেন।

অতএব কোরআন ও সুন্নাহর মূলপাঠগুলোতে যে বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবার সাহাবায়ে কেরাম সে বিষয়ে একমত, সেটাই এই জামাতের পথ এবং তা থেকে সরে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ নেই। আর যে বিষয় সন্দেহপূর্ণ; ওলামায়ে কেরামের মাঝে যা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা আহলে ইলম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের পদ্ধতিতে দলিল প্রমাণ ও সত্যাসত্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে কোন একটি সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন!

এ পর্যায়ে আমরা বলতে চাই, পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, আকিদাহ শুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। তবে এ বিষয়ে এটা মনে রাখতে হবে যে, কেবল আকিদাহ শুদ্ধ করার দ্বারা অন্তরের আমল বিশুদ্ধ হয়ে যায় না। এমন কতজনকে আমরা দেখেছি, যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকিদাহর ব্যাপারে অবগত; গবেষণা করে সেগুলো তারা আত্মস্থ করেছেন, এগুলোর পক্ষে তারা বিভিন্ন বিতর্ক লড়েছেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী, আমানতের ব্যাপারে গাফেল, বিভিন্ন ওয়াজিব ও আবশ্যকীয় বিষয় যেমন জিহাদ, আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার, সত্যের পথে সাহায্য-সহযোগিতা, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মেহনত ইত্যাদি কাজের ব্যাপারে নিস্পৃহ। আমরা দেখেছি এজাতীয় লোকেরা জিন্দিক তাগুত শাসকবর্গের ক্রোড়ে প্রতিপালিত। ক্ষমতাসীনদের খাবারের টেবিলে তারা আমন্ত্রিত। তাগুতদের উপঢৌকনে তারা

সজ্জিত। বাতিলের বিষাক্ত ফল আহার করে তারা বাতিলের গুণকীর্তন করে অথচ তাদের প্রকৃত অবস্থা এসব আলেমের অজানা নয়।

এগুলো তারা করে যাচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, পার্থিব সাজসজ্জা, পদের মোহ এবং বৈষয়িক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে। আর এভাবেই তারা কখনো নিজেদের ইলমের দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে না। এ কারণেই গবেষণা ও তাত্ত্বিকভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদাহ সম্পর্কে তাদের এই জানাশোনা, নিজেদেরকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত দাবি করা, এই জামাআতের আকিদাহগুলোকে শব্দে শব্দে মুখস্থ করা এবং তাদের কিতাবগুলো আত্মস্থ করা—এই সবকিছুই মূলত অস্থায়ী দুনিয়া এবং তার ক্ষয়িষ্ণু সাময়িক তেতো স্বাদকে চিরস্থায়ী পূর্ণাঙ্গ আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়ার ফসল। মনের মাঝে ইচ্ছাশক্তি, অটল বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার অভাবেই তাদের এই অবস্থা। এক কথায়, এমন পরিণতি আল্লাহ তায়ালার তাওফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে ব্যর্থ করে দেন এবং সৎপথ থেকে হটিয়ে দেন। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, যেন তিনি আমাদের দোষ ত্রুটি গোপন করেন এবং আমাদেরকে আফিয়াত দান করেন!

এ কারণেই আকিদাহর পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে ধারণা ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা একান্ত কর্তব্য:-

অন্তরের পরিশুদ্ধি, তাতে জীবনী শক্তি সঞ্চার, ঈমানের হাকীকত তথা আল্লাহ তাআলার মারেফত ও পরিচয়, তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, তাঁকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন, তাঁর মহিমা প্রকাশ, তাঁর বিধিনিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর আয়াতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভক্তি ভালোবাসা সহকারে তাঁর ভয় অন্তরে লালন, এমনিভাবে তাঁর পাকড়াওয়ের ভয় করা, তাঁর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, তাঁর প্রতি আশা রাখা, আন্তরিকভাবে তাঁর শাসন ও হুকুম-আহকামের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা, তার জিকির ও শোকর আদায় করা, তাঁর ইবাদতে অধ্যাবসায়ী হওয়া, তাঁর অবাধ্যতা পরিহারে ধৈর্যশীল হওয়া, তাঁর তাকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা, তাঁর কাছে তওবা করা, তাঁর প্রতি আস্থা রাখা, তাঁর উপর নির্ভর করা, তাঁর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা, নিজের সকল বিষয় তাঁর হাতে ন্যস্ত করা, তাঁর বন্টন ও সবরকম ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া সুসংবাদ ও হুশিয়ার-বাণীসমূহের ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস স্থাপন

করা। একইভাবে নবীজি ﷺ যতরকম গাইবি বিষয়ের সংবাদ এনেছেন সব কিছুর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য অকৃত্রিম নিষ্কলুষ আন্তরিকতা নিয়ে আমল করা, ইখলাসের সঙ্গে তাঁর ইবাদত করা, এমনিভাবে অন্তর সংশ্লিষ্ট আরো বিভিন্ন আমল যেগুলো তাকওয়া ও আমানতদারীর মূল ভিত্তি; যেগুলো বাহ্যিক পরিশুদ্ধির প্রথম শর্ত তথা আত্মিক ও আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির জন্য নিয়ামক শক্তি, তেমন প্রতিটি কর্ম পালনে উদ্যোগী হওয়া।

কারণ তাকওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর পরিচয় দিতে গিয়ে তাবেঈ তলাক ইবনে হাবীব রহিমাহুল্লাহ খুব সুন্দর বলেছেন:

> *“তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহর কাছে থাকা সোয়াবের আশায় তাঁর ইবাদত করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হেদায়েত অনুযায়ী আল্লাহর আযাবের ভয়ে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করা।”*

নিঃসন্দেহে গোটা শরীয়তের প্রধান লক্ষ্য এবং তা শিক্ষা করা ও তদনুযায়ী আমল করার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা, যাতে মুমিন ব্যক্তি সেসব তাকওয়াবান লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

إنما يتقبّل الله من المتقين

তরজমা: (আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের কাছ থেকে কবুল করে থাকেন।)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

তরজমা: (মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

والعاقبة للتقوى

তরজমা: (শুভ পরিণাম নিহিত তাকওয়ার মাঝে।)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

والعاقبة للمتقين

তরজমা: (মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম)

তিনি আরো সংবাদ দিচ্ছেন, ওই জান্নাত যার প্রস্থ হল আসমানসমূহে থেকে জমিন পর্যন্ত

اعدت للمتقين

তরজমা: (তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

তরজমা: (এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

তরজমা: (আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই যারা ভয় করে।)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

তরজমা: (যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।)

তিনি আরো জানিয়েছেন যে,

يحب المتقين

অর্থাৎ তিনি মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন।

আরো জানাচ্ছেন,

مع المتقين

তরজমা: (তিনি মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

তরজমা: (নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্মশীল।)

আর এটাই হল সেই বিশেষ সঙ্গদান যার অর্থ হচ্ছে— সাহায্য সহযোগিতা, শক্তি, সহায়তা ও তাওফিক প্রদান। আর এই সবকিছুই প্রেম-ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির কথা বোঝায়।

তাকওয়া অর্জনে করণীয়

তাকওয়ার মূলকেন্দ্র হচ্ছে অন্তর। তাকওয়ার দ্বারা অন্তর যখন আবাদ হয় তখন তাতে কল্যাণ সাধিত হয়। আর অন্তর যখন কল্যাণময় হয়, তখন ব্যক্তির সকল কাজকর্ম কল্যাণকর হয়ে যায় এবং এস্তেকামাত তথা ব্যক্তির দৃঢ়তা অর্জন হয়। সহিমুসলিম সহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটাই ইরশাদ করেছেন যে,

التقوى ههنا، التقوى ههنا، التقوى ههنا

"তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে।"

এ সময় তিনি নিজ বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করেন।

একইভাবে সহীহাইন সহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে নবীজি ﷺ থেকে বর্ণিত হযরত নোমান ইবনে বশির রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীসে এসেছে:

ألا وإن في الجسدِ مضغةً إذا صلحت صلح الجسدُ كله، وإذا فسدت فسد الجسدُ كله،

ألا وهي القلب

"জেনে রাখ শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো রয়েছে। তা যখন ঠিক হয়ে যায় গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায় গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, গোশতের সেই টুকরোটি হল কলব (অন্তর)।

এর জন্য সহায়ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপায়ের ভেতর সংক্ষেপে কয়েকটি নিম্নরূপ:

◌ চিন্তা ফিকিরের ইবাদত: যেসব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন এবং যেগুলো পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত হল এটি। অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়ে গাফেল এবং এক্ষেত্রে তাদের রয়েছে চরম শিথিলতা।

◌ গুরুত্বসহকারে তাজকিয়া আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাবাদি পাঠ করা: সেসব কিতাব এমন হতে হবে, যেগুলো অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাতে থাকা রোগ নির্ণয়ের পর যথাযথভাবে তার চিকিৎসা করতে পারে। সেসব কিতাবে আলোচনা থাকবে, কেমন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হয়, উত্তম গুণাবলী ও পূণ্যময় বিভিন্ন আদব-শিষ্টাচারের মাধ্যমে কিভাবে অন্তরকে সজ্জিত করা যায়।

◌ ইবাদতের একটি নির্বাচিত অংশ আদায়ে অন্তরকে অভ্যস্ত করে তোলা। আর তা হচ্ছে গুরুত্ব সহকারে ফরজ ও ওয়াজিব আদায় করা, বেশি বেশি নফল ও মুস্তাহাব পালনের চেষ্টা করা এবং প্রত্যেকেরই নিজের এমন কিছু ইবাদত থাকা যেগুলো একান্তই সঙ্গোপনে হয়েছিল।

◌ সালফে সালেহীন, আমাদের পূণ্যবান পূর্বসূরী, আইম্মায়ে কেরাম এবং এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। এজন্য তাদের বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ, সিরাত ও মালফুজাত পাঠ করা। এতে করে তাদেরকে অনুসরণ করার এবং তাদের মত হওয়ার আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগ্রত হয়।

◌ গুরুত্বসহকারে আল্লাহতায়ালার আসমাউল হুসনাহ শেখা, এই নামগুলো মুখস্ত করে ফেলা, এগুলার অর্থ জানা এবং তদ্দ্বারা প্রভাবিত হতে চেষ্টা করা। আর এর জন্য বিশেষভাবে পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই ইলম শিখতে আগ্রহী হওয়া।

এ বিষয়ে অতীতে ও সাম্প্রতিককালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। সমকালীন আলেমদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার গ্রন্থগুলোর একটি হচ্ছে—শাইখ সাঈদ আল-কাহতানী রচিত 'কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে আসমাউল হুসনার ব্যাখ্যা' গ্রন্থটি[১]। এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে, হাদিসের ভাষ্য গ্রন্থ সহ আরও বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিষয়ে অধিক পরিমাণে আলোচনা রয়েছে।

◌ প্রত্যেকেরই নিজের জানা বিষয়ের উপর আমল করা। যখনই কেউ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সঠিক পন্থায় ফিকহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আখলাক ও শামায়েল ইত্যাদি বিষয় থেকে উপকারী ইলম অর্জন করবে, তখন সেটা যত অল্পই হোক না কেন, তার ওপর আমল করতে আরম্ভ করা। এতে করে অজানা আরো অনেক বিষয়ের ইলম এবং তদনুযায়ী আমলের জন্য আল্লাহ তাআলা তার পথ খুলে দেবেন।

ইরজা

আমাদের তানজিমের আকিদাহ কী তা এখন প্রশ্নকারীদের সামনে প্রতিভাত হয়ে গেল। অতএব এখন স্পষ্টভাবে আমরা একথা বলতে পারি যে, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উসূল অনুযায়ী এ কথা বিশ্বাস করি,

> "দ্বীন ও ঈমান হচ্ছে—বলা ও করা; অন্তর ও মুখের বলা এবং অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা করা। আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং নাফরমানির দ্বারা কমে যায়।"

আমরা সর্বপ্রকার এবং সব ধরনের ইরজা মুক্ত। সত্য কথা হচ্ছে, ইরজা এমন নিকৃষ্ট একটি বিষয়, যার রয়েছে নানা রূপ, নানান ধরন, বৈচিত্র্যময় নানা রং। বিভিন্ন চটকদার কারুকার্যখচিত কথা ও বক্তব্যের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ

---

[১] শারহু আসমা-ইল্লাহিল হুসনা ফি দু-ইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ [شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للقحطاني] কিতাবটির লেখক হচ্ছেন শাইখ সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহফ আল-কাহতানী (জন্ম- ১৯৫২ ইংরেজি, মৃত্যু- ১লা অক্টোবর ২০১৮ ইংরেজি)। তিনি হলেন বিখ্যাত "হিসনুল মুসলিমকিত "াবের লেখক।

পায়। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এটির রকমফের হয়। ভয়াবহতার দিক থেকে এটির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ আনীত হকপন্থা যে ব্যক্তি চিনতে পারবে, সাহাবা তাবেয়ীন তাবে-তাবেয়ীনদের আদর্শ যে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবে, আল্লাহর দীনের ফিকহী জ্ঞান যে ব্যক্তি অর্জন করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ সেই ব্যক্তি এই বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

ইরজা'র বিভিন্ন প্রকার

আমরা বুঝতে পারলাম, ইরজার বিভিন্ন প্রকার ও ধরন রয়েছে। এর বৈচিত্র্যময় এমন অনেক চেহারা রয়েছে যেগুলো পূর্বকালে ও বর্তমান কালের ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করে দিয়ে এর থেকে বিরত থাকতে তাগিদ দিয়েছেন। কদর্যতা ও বিভ্রান্তির দিক থেকে এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে যে কয়টি ধরন নিয়ে মোটামুটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে আলোচনা করা আমার জন্য সহজ হয় সেগুলো আমি নিম্নে উল্লেখ করছি, যাতে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং এগুলো পরিহার করা সম্ভব হয়।

◌ ইরজা'র সবচেয়ে জঘন্য প্রকার, যা চরম সীমালঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে, তা হচ্ছে একথা বলা যে, মারিফাতের নামই হচ্ছে ঈমান। মারিফাত বলতে অন্তরের দ্বারা চেনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তর থেকে আল্লাহকে চিনতে পারবে যদিও সে অন্তর থেকে আল্লাহকে সত্যায়ন করে না (যদিও এটি খুবই কঠিন তবে এটি ওই অবস্থায় সম্ভব যদি সে পরিচয় লাভ ও সত্যায়নের মাঝে পার্থক্য করাকে সম্ভব মনে করে) তবে কেবল এই পরিচয় লাভের মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হয়ে যাবে।

এই জাতীয় মুরজিয়াদের মতে স্থির বিশ্বাস (তাসদীক), স্বীকারোক্তি, ইসলাম ও ঈমানের বিভিন্ন আলামত মুখে উচ্চারণ করা এমনিভাবে মুসলমানদের মতো কাজকর্ম করা এগুলো কোনটাই ঈমানের সংজ্ঞার ভেতর পড়ে না। আর এটাই হল জাহমিয়া ফিরকার বক্তব্য। তাদের কথার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কেবল পরিচয় (মারেফাত) লাভ করবে, সেই মুমিন বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে নিজের মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কী কথা ও কাজ প্রকাশ করছে তার দিকে তাকানো হবে না। এমনকি সে যদি নিজের মুখ দ্বারা কুফরি প্রকাশ করে, তখনো যতক্ষণ পর্যন্ত

সে একথা জানবে যে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র আসল উপাস্য, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন থাকবে।

তাদের এমন অবস্থান মেনে নিলে এটাই বলতে হয়, শয়তান ফেরাউন, কারুন, হামান, আবুজাহেল এবং এদের মত সকলেই মুমিন। আমরা আল্লাহর কাছে কুফরি ও পথভ্রষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করছি! তাদের এমন অবস্থান নিঃসন্দেহে কুফরি। এর দ্বারা ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এই মাযহাব কোরআনের সুস্পষ্ট বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ আনীত আদর্শের বিরোধী।

◌ আরেক প্রকার মুরজিয়া গোষ্ঠীর বক্তব্য হল, ইমান হচ্ছে কেবল মুখে স্বীকার করার নাম। অতএব যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা ঈমানের স্বীকারোক্তি দেবে সে মুমিন বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তার অন্তরে কি রয়েছে সে দিকে তাকানো হবে না নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক!

এটি এমন একটি গোষ্ঠীর বক্তব্য যাদেরকে কারামিয়া বলা হয়। (মুহাম্মদ ইবনে কারাম সিজিস্তানী নামক এক ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে এই নাম দেয়া হয়েছে) এদের মতে মুনাফিকরা দুনিয়াতে কামিল ঈমানদার বলে গণ্য হবে কারণ তারা তাদের মুখের দ্বারা ঈমানের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। কিন্তু আখেরাতে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে আফিয়াত ও সালামত কামনা করছি। কোন সন্দেহ নেই যে, এটি একটি ভ্রান্ত ও স্ববিরোধী মাযহাব। এটি কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত হকের বিপরীত। যদিও কোন সন্দেহ নেই যে, মুনাফিকরা অন্তরের দিক থেকে কাফের, মুমিন নয়। তবে দুনিয়াতে তারা মুসলমান বলে গণ্য হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান প্রযোজ্য হয়। তাই এভাবে বলা যেতে পারে, তারা ওই ব্যক্তির দৃষ্টিতে মুসলমান যে তাদের নেফাক তথা আভ্যন্তরীণ কুফরি সম্পর্কে অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে অবগত নয়। আর এটি সেসব অবস্থার একটি যেসব অবস্থায় ইসলাম ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

◌ আরেক প্রকার ইরজা আক্রান্ত বক্তব্য হচ্ছে, ঈমান কেবল অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করার নাম। অর্থাৎ মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কর্ম সাধন কোনটাই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটাই হল আশাআরী মাতুরিদিদের অনেক মুতাকাল্লিমদের (কালাম শাস্ত্রবিদের) বক্তব্য।

এবং তারা বলেছেন, নিশ্চয়ই মুখের স্বীকারোক্তি কেবল দুনিয়াতে ইসলামের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবার শর্ত। এটি মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের এমন বক্তব্য যে বাতিল এবং কোরআন-সুন্নাহর দলিলাদি ও সালফে-সালেহীনের সর্বসম্মত পন্থার বিরোধী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসব জামাতের মধ্যে সবারই বক্তব্য হচ্ছে, গুনাহের দ্বারা ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। ঈমান বাড়ে ও কমে এমন টা মেনে নিতে তারা রাজি নন। আমরা আল্লাহর কাছে বিভ্রান্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

◌ ইরজা'র আরেকটি প্রকার হচ্ছে, একথা বলা— ঈমান হচ্ছে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা (সত্যায়ন করা) এবং মুখের দ্বারা স্বীকার করার নাম। এটুকুই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা মূল ঈমানের (ঈমানের সংজ্ঞার) অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তারা এ কথা বলেন, নিশ্চয়ই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা ঈমানের জন্য একান্ত আবশ্যক।

আমাদের আহলুস সুন্নাহর ওলামায়ে কেরামের নিকট এটি 'ফুকাহায়ে কেরামের ইরজা' হিসাবে পরিচিত। এই বক্তব্য সম্বন্ধিত করা হয় ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এবং তার শাইখ আহমাদ ইবনে আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহ সহ আরো কারো কারো প্রতি।

কোন সন্দেহ নেই যে এটি ভুল। কুরআন-সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন মূলপাঠ এবং এ মতের প্রবক্তাদেরও পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তা কখনই এমনটা নয়। তবে পূর্বোল্লিখিত সকল ভ্রান্ত মতের তুলনায় এই মতটির বিভ্রান্তি অতি সামান্য। এমনকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একদল আলেম এমনটাও বলেছেন যে, তাদের সঙ্গে আহলুস সুন্নাতের মতপার্থক্য কেবল বাহ্যিক ও লফযী।

ইরজা'র আধুনিক রূপ

ইরজার বিভিন্ন নব্য রূপ আদতে জাহমিয়াহ এবং তাদের বিভিন্ন দলসমূহের ঐসব নিকৃষ্ট আকিদাহসমূহের বহিঃপ্রকাশ যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এগুলো বর্তমান যুগের বিভিন্ন বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারীরা পুনর্জীবিত করেছে, প্রচার করেছে এবং সুসজ্জিত করে পেশ করেছে। এদের অধিকাংশই হল তাওয়াগীত

এবং সুলতানদের অনুগত নির্বোধ ও তোষামোদকারী, এবং দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া কামাইকারী। যেমন পূর্ববর্তী অনেক সালাফ ইরজা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েছে বলেছেন যে, ইরজা হল এমন দ্বীন যা শাসকের পছন্দনীয়।

যেমন তারা (নব্য ইরজাগ্রস্থরা) বলে থাকে -

- জুহুদ (ইচ্ছাকৃত অস্বীকার) ছাড়া কুফর নেই।
- তাকযিব (মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) ছাড়া কুফর নেই। অর্থাৎ কুফর শুধু এই প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
- ইস্তিহলালের (অর্থাৎ অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহের দ্ব্যর্থহীন মূল পাঠ দ্বারা অথবা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কোন হারাম বা কুফরি কাজকে হালাল সাব্যস্ত করা) সাথে হওয়া ব্যতিত কুফর নেই।
- ইতিকাদের (বিশ্বাস) সাথে না হলে তা কুফর হবে না। কুফর শুধুমাত্র ইতিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এমন কোন কাজ নেই, যা স্বতন্ত্রভাবে কুফরে আকবর এবং স্বয়ং সেই কাজটি ব্যক্তিকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। কেবল সেই কাজ যখন ইতিকাদের সাথে হবে তখন তা কুফরি হবে। আর ইতিকাদের সাথে যেটা হয়, সেটা হল তাকযিব (মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ) ও জুহুদ (ইচ্ছাকৃত অস্বীকার) অথবা ইস্তিহলাল ।
- ব্যক্তি যদি কুফরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য না করে তাহলে কাজ কুফর হবে না। অর্থাৎ কেউ মন থেকে কাফের হতে চাইলে এবং কুফরীর ব্যাপারে তার বক্ষ উন্মোচিত হয়ে গেলে তবেই সে ব্যক্তি কাফের হবে।
- কোন কাজ সত্ত্বাগতভাবে কুফর আকবর নয়। বরং সেই কাজটি যদি শরঈ দলিল দ্বারা কুফর আকবর বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, কাজটি অন্তরে (কলবে) কুফর থাকার প্রমাণ।

সুতরাং এই সবগুলো প্রকার-ই হচ্ছে ইরজার নিকৃষ্ট প্রকার, যা থেকে আমরা বারাআত ঘোষণা করছি"। এবং সবকটি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আহলুস সুন্নাহর আকিদাহ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত —আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করুন, তাদেরকে ইজ্জত দান করুন, তাদের জনবল বৃদ্ধি করে দিন—এর আকিদাহ হচ্ছে:

ইমান হচ্ছে বলা, কার্য সম্পাদন করা ও নিয়ত করার নাম। ঈমান বাড়ে ও কমে। আর ঈমানের বিপরীত হচ্ছে কুফরি যা আকিদাহ পরিবর্তন, সন্দেহ পোষণ, কথা, কাজ এবং পরিহারের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে কুফরি হয়ে থাকে, কখনো অস্বীকারের কারণে হয়ে থাকে, কখনো সন্দেহের কারণে হয়ে থাকে, কখনো অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশের কারণে হয়ে থাকে, কখনো বিমুখ হওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে, এমনকি কখনো অজ্ঞতার কারণেও হয়ে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে থাকেন, শরিয়া দলিল দ্বারা যে বিষয় মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়ার মত কুফুরি বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে বিষয়টি আসলেই কুফুরি এবং একে কুফরি-ই বলা হবে।

(শরিয়া দলিল দ্বারা কুফুরি বলে প্রমাণিত) কাজের ব্যাপারে এমনটা বলা যাবে না যে –

এমন ব্যক্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যাচাই করতে হবে সে ঐ কাজটিকে কুফর বলে বিশ্বাস করে কি না – তার আগে এ কাজটিকে কুফরি বলা যাবে না।

অথবা, সে এই কুফরি কাজকে হালাল মনে করে কি করে না, সেটা দেখার আগে এই কাজকে কুফরি বলা যাবে না।

অথবা, সে আসলেই অবিশ্বাসকারী ও অস্বীকারকারী কি-না, সেটা দেখার আগে এই কাজকে কুফরি বলা যাবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে, শরিয়া দলিল দ্বারা যে বিষয় মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়ার মত কুফুরি বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে বিষয়টি আসলেই কুফুরি এবং একে কুফরি-ই বলা হবে।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, যেন তিনি হেদায়েতের পথে আমাদেরকে অবিচল রাখেন এবং বিভ্রান্তকারী ফিতনা থেকে আমাদেরকে আশ্রয় দান করেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা

জানা আবশ্যক যে, আহলে সুন্নাতের কতিপয় ওলামা কখনো এমন কথা বলে থাকেন, যা পূর্বোক্ত ইরজা-আক্রান্ত কিছু কিছু বক্তব্যের সঙ্গে কখনো কখনো মিলে যায় এবং তাতে সামান্য পর্যায়ের ও অস্পষ্ট রকমের ইরজা পাওয়া যায়। যদিও তারা সামগ্রিক বিবেচনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদাহর উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তবুও সেসব ক্ষেত্রে তারা ভুলের শিকার। ইজতিহাদের পর তারা এমন কিছুকে সঠিক বলে ধরে নিয়েছেন, যা মুরজিয়া গোষ্ঠীর কথার সঙ্গে মিলে যায়।

এমন ব্যক্তিদেরকে আমরা তাড়াহুড়ো করে মুরজিয়া বলে আখ্যায়িত করবো না।

এমতাবস্থায় যদি ব্যাপারটা এমন গুরুতর হয় যে, তার এই পদস্খলনের কথা প্রকাশ করে মানুষকে তা থেকে বিরত রাখা একান্ত জরুরি, তবে সে ক্ষেত্রে এভাবে বলতে হবে,

"অমুক মাসআলায় তিনি ভুল করেছেন এবং মুরজিয়াদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন; তিনি এমন বক্তব্য দিয়েছেন যা পরিণতিতে মুরজিয়া গোষ্ঠীর বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায় আর তা হচ্ছে এই এই এই..."

আসলে মানুষকে তার বাহ্যিক ও সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করেই কোন কিছুর দিকে সম্পর্কিত করা উচিত। এককথায় এসব ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই, সর্তকতা অবলম্বন এবং কাউকে বিদআতি বলে আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা একান্তই জরুরী। বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রে, যাদের ফজিলত সকলের সামনে স্পষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা কল্যাণের পথে ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত। যারা সুন্নাহ'কে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী, সুন্নাহর প্রতি অতি আগ্রহী, সুন্নতের পক্ষে প্রতিরক্ষাকারী এবং সুন্নাহ অনুসরণে অতিশয় মনোযোগী বলে লোক সমাজে পরিচিত।

তাকফির

এবার আসি প্রশ্নকারীর কাছে। তিনি বলেছেন, তাকফিরের মাসআলায় আপনাদের বক্তব্য কী?

আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা সহকারে এর জবাব লিখতে আরম্ভ করছি — তাকফিরের মাসআলাটি ইসলাম ও ঈমান সংক্রান্ত মাসআলার একটি শাখা আলোচনা। কারণ কুফরি ঈমানের বিপরীত। আর আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা যা তাওহিদের বিপরীত সেটিও একপ্রকার কুফরি। আল্লাহ্র প্রশংসা যে, আমরা প্রতিটি অধ্যায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে আমরা সে বিষয় উল্লেখ করেছি। তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হচ্ছে ঈমানের মাসআলা অর্থাৎ,

- ঈমানের সংজ্ঞা কী?
- ঈমানের পরিচয় কী?
- ঈমানের বিপরীত ও ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলোর পরিচয় কী?
- আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তাওহিদ কাকে বলে?
- তাওহিদে রুবুবিয়্যাহ্ কী?
- তাওহিদে উলুহিয়াত কী?
- আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাওহিদ কী রূপ?
- এসব ক্ষেত্রে তাওহিদ বিধ্বংসী এবং এর বিপরীত বিষয়গুলো কী কী?
- সেই বিষয়গুলো কী যেগুলোর দ্বারা কাফের ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান বলে গণ্য হয়?
- সেই বিষয়গুলো কী কী যেগুলোর দ্বারা মুসলমান ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফের মুরতাদ হয়ে যায়? (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালিক)

এই সকল বিষয়ে আমরা আমাদের ওলামায়ে কেরাম এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামদের মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাকফিরের মাসালা এবং এই নিয়ে কথা বলার জন্য আকিদাহ্, ঈমান ও তাওহিদ সংক্রান্ত কিতাবাদি এবং ফিকহের কিতাবে ফুক্বাহায়ে কেরাম রিদ্দা—আল্লাহ

আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন— সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদগুলোতে রিদ্দার বিধি-বিধান ও মুরতাদের হুকুম আহকাম নিয়ে যা কিছু বলেছেন, সেই সব কিছুর সংক্ষিপ্তসার আমাদের সামনে থাকতে হবে।

এ কারণেই আমরা সর্বদা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে সতর্ক করে থাকি, যে কেবল-ই তাওহিদ ও আকিদাহ সংক্রান্ত কিতাবের উপর ভিত্তি করেই তাকফিরের মাসআলা ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান বুঝতে গিয়ে ভুলের শিকার হয়। ঈমান-আকিদাহ সংক্রান্ত কিতাব থেকে তারা কিছু অংশ জেনে নিয়ে ফিকহের জ্ঞানলাভ করা ছাড়াই এবং ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য, তাদের পথ ও পন্থা এবং তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দিকে না তাকিয়েই ঢালাওভাবে হুকুম দিতে আরম্ভ করে।

সাম্প্রতিককালে এই মাসআলার ওপর বেশকিছু পুস্তিকা রচিত হয়েছে। এমনিভাবে ইসলাম বিধ্বংসী বিভিন্ন উক্তিমূলক বা কার্যমূলক ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের ওপর পুস্তিকা রয়েছে। কিছু আছে খুবই চমৎকার আবার কিছু আছে তেমন মানসম্মত নয়। তালিবুল ইলমের দায়িত্ব হচ্ছে, সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়া, নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা লাভ করা, অস্পষ্ট জায়গাগুলো তাদের কাছে গিয়ে বুঝে নেয়া, কিতাবাদির আধিক্যের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ থেকে বর্ণিত যে ফায়দার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়া,

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দোয়া দিয়ে রাতের নামাজ শুরু করতেন সে দোয়া খুব বেশি বেশি পাঠ করা আর তা হচ্ছে—

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السمواتِ والأرض، عالمَ الغيب والشهادة،

أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنِكَ،

إنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم

তাওফিক তো একমাত্র আল্লাহরই হাতে।

তাকফিরের মাসআলায় বক্তব্য

এ পর্যায়ে আমি তাকফিরের মাসআলার ওপর কয়েকটি কথা বর্ণনা করবো যা ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে:

প্রথম কথা: তাকফির বলা হয় কোন ব্যক্তির কুফরীর ব্যাপারে হুকুম দেয়াকে। আর এই অর্থটিই বহুল ব্যবহৃত। তবে কখনো কখনো কোন কাজকে কুফুরি হিসাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও তাকফির শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, শরীয়তের বিধি-বিধান প্রযোজ্য এমন লোকদের কার্যকলাপের মধ্যে অমুক কাজটি (সেটা হতে পারে কোন কিছু করা বা ছেড়ে দেয়া, হতে পারে কোন উক্তি অথবা বিশ্বাসের পরিবর্তন, যার মাঝে রয়েছে সংশয় সন্দেহ) আমাদের দ্বীন ও শরীয়তে এমন কুফরি বলে পরিগণিত যা ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিস্কৃত করে দেয়—এরূপ হুকুম দেয়া। পরিভাষায় একে তাকফিরে মুতলাক (অনির্দিষ্ট বা সাধারণ তাকফির) বলা হয়।

দ্বিতীয় কথা: তাকফির চাই সেটা মুতলাক হোক (অর্থাৎ কোন কিছু করা, কোন কিছু পরিহার করা, কোন উক্তি অথবা কোন ধরনের বিশ্বাস—সংশয় সন্দেহ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত—এগুলোর ব্যাপারে কুফুরির হুকুম দেয়া) অথবা মুআইয়ান (অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরির হুকুম প্রয়োগ করা এবং এভাবে বলা যে সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত কাফের; সে মুসলমান নয়), তা একটি শরিয়া হুকুম। অন্যান্য শরিয়া হুকুম-আহকামের মতোই এর অবস্থা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসা দলিল ব্যতিরেকে এ বিষয়ে কথা বলা জায়েজ নয়। অর্থাৎ এ বিষয়ে কথা বলতে হলে পূত-পবিত্র শরীয়তের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাগবে। অতএব কুরআন সুন্নাহের বিশুদ্ধ দলিল এবং এ দুটোর আলোকে শরীয়তের কোন মূলনীতির দ্বারা যদি প্রমাণিত হয়, 'অমুক কাজটি কুফরি' তাহলে আমরা বলবো, সেটি আসলেই কুফরি।

এরপর আমরা হুকুম বর্ণনার জন্য এবং সর্তকতা, সচেতনতা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য শর্তহীনভাবে এভাবে বলব: যে ব্যক্তি এ কাজটি করবে সে কাফের।

এরপর সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি অর্থাৎ, অমুকের ছেলে অমুক যার দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হয়েছে, তার ব্যাপারে তখনই আমরা কুফরীর হুকুম প্রয়োগ করব, যখন তাকফিরের সকল শর্ত পাওয়া যাবে এবং তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহের

মধ্যে কোনটি উপস্থিত থাকবে না। আর একেই বলা হয় তাকফির আল মুআইয়্যান (সুনির্দিষ্ট তাকফির)।

তৃতীয় কথা: যখন আমরা জানতে পারলাম তাকফির একটি শরিয়া হুকুম; প্রমাণিত হওয়ার দিক থেকে শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকামের মতোই এর অবস্থা, অতএব এর মধ্যে কিছু এমন রয়েছে যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত। যেমন ইহুদী-খ্রিস্টানদের কাফের হওয়া, মূর্তি পূজকদের কাফের হওয়া যেমন আরবের সেসব মুশরিকের অবস্থা যাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন। এমনিভাবে বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দু সম্প্রদায় যারা গো-পূজারি, এমনিভাবে বুদ্ধের অনুসারী বৌদ্ধরা, এমনই ইসলাম ভিন্ন অন্য যত ধর্মমত ও মতবাদ রয়েছে সেগুলোর অনুসারীরা।

আরো ব্যাপকভাবে বললে...এমন প্রতিটি শ্রেণি, যারা কখনোই ইসলামে দীক্ষিত হয়নি এবং ইসলামের দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধিত করেনি, তারা সকলেই অকাট্যভাবে কাফের। এদের অবস্থা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি! তো এদের কুফুরী অর্থাৎ তারা যে কাফের সেটা অকাট্য ও জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। **তাদেরকে জানে এমন প্রতিটি মুসলমানের জন্য তাদেরকে কাফের বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব।**

তাকফির সংক্রান্ত আলোচনার মাঝে কিছু আছে যা পূর্বোক্ত আলোচনার সঙ্গে সংযোজিত। যেমন ওই মুরতাদের অবস্থা যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মিল্লাতে ইসলাম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে। যেমন ঐ সমস্ত লোক যারা নাউজুবিল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে, দ্বীন ইসলামের প্রতি কুফরি করার ঘোষণা দিয়েছে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

এদের অবস্থার কাছাকাছি হচ্ছে নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবিদারদের অনুসারীদের কুফরি। যেমন মুসাইলামাতুল কাযযাব (আল্লাহ তাকে লা'নত করুন)-এর অনুসারীরা এবং যুগে যুগে বিভিন্ন দাজ্জাল ও নবুয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের অনুগামী ব্যক্তিরা।

অতঃপর—ঐ ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট কুফরী করেছে, দ্বীনকে গালি দিয়েছে এবং এমন সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর দীনের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে যাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এই ব্যক্তির অবস্থা তখন অকাট্য রূপ ধারণ করে, যখন সে

একই কাজ বারবার করে। এদের মাঝে কারও কারও কুফুরি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কুফরি অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ও জঘন্য।

এমনই এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।

তাকফিরের কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো উপরোক্ত বিষয়গুলো অপেক্ষা হালকা ধরনের। যেমন কোনো যোগ্য ফকিহের ফয়সালা কৃত ইজতিহাদী হুকুম।

যেমন কোন শাসকের ব্যাপারে এই ফয়সালা দেয়া যে, সে শরীয়তের দ্বারা বিচার ফায়সালা না করার কারণে কুফরী করেছে। তো এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

যেমন ঐ ব্যক্তি যে মূলগতভাবে এই শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করেছে; শরীয়তের কোন হুকুমই সে বাস্তবায়ন করে না। অথবা ঐ ব্যক্তি যে শরীয়তের কিছু হুকুম প্রয়োগ করে আবার কিছু হুকুম ছেড়ে দেয়। তার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা থাকে, সে নিজে দাবি করবে অথবা তার পক্ষ থেকে এই দাবী করা হবে যে, যেসব ক্ষেত্রে সে শরীয়তের হুকুম প্রয়োগ করতে পারেনি সেসব ক্ষেত্রে তার কোন ওজর বা তাবীল আছে। কিছু লোক আছে যাদের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ অথবা তাবীলের সম্ভাবনা রয়েছে, আবার এমন অনেক আছে যাদের ব্যাপারে তেমন কোনো সংশয় সন্দেহ নেই। এরকম বিভিন্ন স্তর এক্ষেত্রে থাকতে পারে।

যেমন ঐ ব্যক্তি, যে এমন কোন কাজ করলো, যার দরুন তাকে কাফের বলা যাবে কিনা এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি ক্রুশ ঝোলালো অথবা একেবারে পুরোপুরি ভাবে সালাত ত্যাগ করল ইত্যাদি, এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ তাকে কাফের বলার মতকে প্রাধান্য দিয়েছে।

শাইখ মোহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন:

> *"তাকফিরের উৎস তথা যে দলিলের ভিত্তিতে তাকফির করা হয়, সেটা কখনো ধারণাপ্রসূত হতে পারে। এর দৃষ্টান্ত হলো, জিহাদ অবস্থায় যখন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সংশয় দেখা দেবে, সে মুসলমান কি-না, তখন অনুমান করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এমনটা মনে করা উচিত হবে না, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকফির করা বা না করা অকাট্যভাবে সঠিক হতে হবে। বরং তাকফির একটি শরিয়া হুকুম।*
>
> *এই হুকুমের দ্বারা প্রাণ ও সম্পদ হালাল হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা করা হয়। অতএব এটির দলিল অন্যান্য সকল শরিয়া হুকুম-*

আহকামের মতই। অতএব কখনো অকাট্য দলিলের মাধ্যমে তাকফির করা হবে, কখনো প্রবল ধারণার ভিত্তিতে, আবার কখনো এতদুভয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে তাকফির করা হবে। আর যেখানেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেবে সেখানে তাকফির থেকে বিরত থাকাটাই উত্তম।"—'ইকফারুল মুলহিদিন ফি জরুরিয়াতিদ্ দ্বীন' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এবং সেখান ইমাম গাযযালী লিখিত 'তাফরিক্বা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

চতুর্থ কথা: শরীয়তের মুকাল্লাফ ব্যক্তিদের কার্যকলাপের মধ্যে কোনটি কুফরি কোনটি কুফরি নয়, সে বিষয়ে হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন যেমনভাবে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ হতে পারে, একইভাবে তাকফির আল মুআইয়ান তথা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপর কুফরীর হুকুম প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। আর এর কারণ মূলত তাকফিরের শর্তাবলী, প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ এবং সেগুলো পাওয়া যাওয়া না যাওয়া নিয়ে পর্যবেক্ষণের ভিন্নতা।

পঞ্চম কথা: পূর্বের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলবো, আহলে ইসলামের মধ্য থেকে, অর্থাৎ আগে থেকে যে ব্যক্তি মুসলমান বলেই গণ্য এবং তার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত, তাঁর বিরুদ্ধে আল্লাহতায়ালার শরীয়তের সুনির্দিষ্ট দলিল পাওয়ার আগে পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না। আর তাছাড়া তাকফিরের হুকুম একটি শরিয়া হুকুম। সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়া না হওয়ার দিক থেকে এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে যেমনটা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

তাকফিরের বিভিন্ন স্তর

সবচেয়ে স্পষ্ট স্তর হল, সকল মুসলমান অথবা অধিকাংশ মুসলমান কিংবা মধ্যম স্তরের মুসলমানেরা যা বুঝতে পারে। এই স্তরটি বোঝার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলেম ও সাধারণ যে কোন ব্যক্তি সমান হয়ে থাকে। যেমন ইতিপূর্বে কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে আরো বলা যায় -

এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে গালি দিয়েছে, তাঁর দ্বীনকে গালি দিয়েছে এবং এমন সুস্পষ্টভাবে এর সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে যে তাতে কোন

প্রকার অস্পষ্টতা নেই। বিশেষ করে ওই ব্যক্তি যখন একই কাজ বারবার করে। তো এমন ব্যক্তিকে কাফের বলার জন্য কোন আলেমের ফতোয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ সাধারণ মানুষ সকলেই তার উক্ত কাজকে এমন কুফুরি বলে মনে করে যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করে দেয়। অতএব যে ব্যক্তি কাউকে এমন কাজ করতে দেখবে, আর সে বাধ্যও নয়, (যেমন কোন তাগুত তাকে জেলের ভেতরে এ কাজ করতে বাধ্য করছে অথবা এ কাজ না করাতে তাকে শাস্তি দিচ্ছে), পাগলও নয়, (কারণ মুসলমান পাগল সর্বাবস্থায় মুসলমান বলেই গণ্য হবে এবং তার রিদ্দা সহীহ হবে না) তবে এমন ব্যক্তির কুফুরীর হুকুম দিয়ে দেয়া যাবে।

এবার আসি অস্পষ্ট ক্ষেত্রের আলোচনায়। যেসব ক্ষেত্রে আহলে ইলমের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যে, আলোচ্য কাজটি কুফরি কি কুফরি না? অথবা এ বিষয়ে মতপার্থক্য ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে, কেউ অমুক কাজ করলে তাঁকে কাফের বলা যাবে কি-না? অর্থাৎ তার কোন ওযর আছে কিনা; তার বেলায় তাকফিরের সকল শর্ত পাওয়া গিয়েছে কি-না? অথবা তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহের সবগুলোই তার বেলায় অনুপস্থিত কি-না?

সেসব ক্ষেত্রের মাসআলা উলামায়ে কেরামের জন্য রেখে দেয়া উচিত এবং আহলে ইলমের বাইরে কারো এ নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। কারণ এখানে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। আর বিশেষ করে তাকফিরের এই বিষয়টিতে ভুল খুবই মারাত্মক এবং তার পরিণতি খুবই কঠিন। কারণ শরীয়তে অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে কাফের বলার জন্য অগ্রসর হতে এবং তাড়াহুড়া করে কাউকে তাকফির করতে নিষেধ করা হয়েছে। একাজে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। তাই দ্বীন সচেতন ও পরকালে মুক্তি পেতে আগ্রহী মুমিন ব্যক্তির উচিত, তাকফিরের যোগ্য নয় এমন ব্যক্তিকে তাকফির করে কঠোর হুঁশিয়ারি অমান্য করতে সে যেন ভয় করে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ!

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করি যেন তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে হেদায়েত ও সঠিক পথের দিশা দান করেন!

তুরস্কের প্রেক্ষাপট

এবার আসি তুরস্ক এবং তার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে। আসলে এর জন্য বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। প্রতিটি মাসআলা পৃথকভাবে আলোচনা ও আলাদা করে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পূর্বের আলোচনার আলোকে আমরা বলবো, এখানকার সাধারণ ভাইদের কর্তব্য হলো, ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করা। কিতাবাদিতে ওলামায়ে কেরামের লিখিত বাক্যাবলী পাঠ করে নিজেদের মতো বুঝেই নিজেরা তাড়াহুড়ো করে মানুষকে তাকফির না করা। কারণ এতে তারা জঘন্য ভুলের শিকার হবেন। কারণ একজন সাধারণ ভাই সেসব কিতাব থেকে যা বুঝবেন তাই প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে কখনো তার বোঝার ভুল হতে পারে কখনো প্রয়োগের ভুল হতে পারে আবার কখনও উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ভুলের শিকার হতে পারেন। এতে বিরাট ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে।

এজন্য বারংবার আমরা এই নসিহত করছি, তাকফিরের মাসআলা-মাসায়েল যেন ওলামায়ে কেরামের জন্য রেখে দেয়া হয়। যুবক ভাইদের এটি জেনে রাখা উচিত,

তাকফিরের অধিকাংশ মাসআলা ইজতিহাদী, যাতে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব কেউ যেন নির্দিষ্ট কোন উক্তি, নির্দিষ্ট কোন শায়খ অথবা নির্দিষ্ট কোন জামাতকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, নির্দিষ্ট কিছু লোক অথবা নির্দিষ্ট কোনো জামাতকে—যাদেরকে তাকফিরের বিষয়টি ইজতিহাদী—তাকফির করার ক্ষেত্রে সৃষ্ট মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে তারা যেন পরস্পরে শত্রু মনোভাবাপন্ন হয়ে না থাকে। বরং তালেবুল ইলমদের মধ্যে যদি কারো সামনে গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের দ্বারা সত্যটি উন্মোচিত হয়ে থাকে এবং সে বিষয়ে তার স্থির বিশ্বাস অর্জিত হয়, তবে সে তদনুযায়ী আমল করবে। আর যার সামনে স্পষ্ট হবে না সে সর্তকতা অবলম্বন করবে। কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্নমতের ভাইয়ের অপারগতা বুঝতে চেষ্টা করবে। এটাই সঠিক পন্থা। এ পন্থা অনুসরণ করা ছাড়া কখনই কল্যাণ সাধিত হতে পারে না এবং পরিশুদ্ধি আসতে পারে না। যুবকেরা কখনো কখনো অনর্থ সৃষ্টির কাজে লেগে যায়, তারা দ্বীন থেকে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় আর ভাবে যে, তারা ভালো কাজ করছে এবং আল্লাহর দ্বীনের সহায়তা করছে! এতে তারা কঠোর হুঁশিয়ারি অমান্যকারী বলে সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ

তরজমা: তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধা দান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (সূরা আন নাহল: ৯৪)

ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন:

“আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে নিষেধ করে দিচ্ছেন যাতে তারা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্বের বাহানা না বানায় অর্থাৎ তাদের কসমগুলো যাতে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কারণ না হয় এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাতে পা ফসকে না যায়। এটি দিয়ে তুলনা করা হয়েছে ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল অতঃপর তা থেকে সরে এসেছে এবং হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তার কারণ হচ্ছে, সেসব কসম যেগুলো ভঙ্গ করা হয়েছিল যদ্দরুন আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরানোর কাজ সংঘটিত হয়েছে। কারণ কাফের যখন দেখবে, মুমিন ব্যক্তি তার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন দ্বীনের প্রতি তার কোন আস্থা অবশিষ্ট থাকবে না। এতে করে সে ইসলামে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।”

এখন কসম নিয়ে ছেলেমানুষি করা এবং একে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কারণ বানানোয় যদি এভাবে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয়া হয় আর তার ওপর এতটা কঠোর হুঁশিয়ারি এসে থাকে, তবে তাকফিরের হুকুম-আহকাম নিয়ে ছেলেখেলা করার দ্বারা, অজ্ঞতা, বাড়াবাড়ি, অন্ধ অনুসরণ ও তাড়াহুড়া করে তাকফির ঘনিষ্ঠ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দ্বারা মানুষ কতটা আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে পারে তা কি চিন্তা করা যায়! নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমটির চাইতেও মারাত্মক। এটি আমরা সকলেই জানি। অতএব যুবক মুজাহিদ এবং আল্লাহর পথের দায়ীদের এ থেকে অতি গুরুত্ব সহকারে বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দাতা!

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আযিযের “আল-জামী” কিতাবের ব্যাপারে

প্রশ্নে বর্ণিত শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আবদুল আযিযের কিতাবাদির ব্যাপারে কথা হল, শাইখের সবগুলো কিতাবের সামষ্টিক মূর্তরূপ হচ্ছে তার রচিত الجامع في طلب العلم الشريف গ্রন্থখানা। আর ইতিপূর্বে আমরা এবং আরো অনেকেই এই কিতাবে থাকা কিছু মানহাজ-গত আর কিছু শাখাগত ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনারা সে আলোচনা দেখে নিতে পারেন।

তবে আমি বিশেষভাবে তুর্কি ভাইদেরকে এ কিতাবটি পরিহার করতে নসীহত করব।

কারণ এ গ্রন্থখানার অনেক ফায়দা সত্ত্বেও নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় এবং বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত থেকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এটি কেবল এমন তালিবুল ইলমের পক্ষেই সম্ভব, ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় যার পদচারণা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিজের জন্য যে উত্তম সুদৃঢ় মাইলফলক স্থাপন করে রেখেছে। আর যে এমন তালিবুল ইলম হতে পারবে না তার জন্য এই গ্রন্থটি ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

আমি সংবাদ পেয়েছি তুর্কি কিছু ভাই গ্রন্থটি তাদের ভাষায় অনুবাদ করতে চাচ্ছেন। আমি তাদেরকে দুটি কারণে এ কাজ করতে বারণ করব: প্রথম কারণ তো বলাই হল। আর তা হচ্ছে, ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় পদচারণা রয়েছে এমন তালিবুল ইলম ছাড়া অন্য কেউই সহজে এ কিতাবটি দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। আর যে তালিবুল ইলম এর দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হতে পারবে, তার জন্য উত্তম হচ্ছে, অনুবাদের বদলে মূল আরবী গ্রন্থ অধ্যয়ন করা।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে: এজাতীয় গ্রন্থের ভাষান্তরের কাজ খুবই কঠিন। কারণ অনুবাদ ও ভাষান্তর এমন একটি শাস্ত্র ও শিল্প, যোগ্য ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কারো যেখানে হাত দেয়া উচিত নয়। আর এ জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদের জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যিনি আরবি ভাষা জ্ঞান, ফিকহ ও ইসলামী শরীয়তের ওপর গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবেন। আর এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। এখন যদি অল্প কিছু আরবি জানা অথবা মধ্যম পর্যায়ের আরবি জানা কোন ভাই এ গ্রন্থ

ভাষান্তরের কাজ হাতে নেন, যিনি ফিকহ ও ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী নন, তবে এমন ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি ও অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদিও তিনি মনে করছেন, তিনি খুবই উত্তম কাজ করে যাচ্ছেন।

অতএব পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী না হলে কারো জন্য এমন কাজ করতে অগ্রসর হওয়া জায়েজ নয়। সঠিক ভাষান্তর, সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয় উপস্থাপন, আরবী থেকে সংশ্লিষ্ট ভাষায় ত্রুটিমুক্ত পরিপূর্ণ অনুবাদ ইত্যাদি কঠিনতম কাজের উপযোগিতা ছাড়া একাজ হাতে নেয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না। এসব বিষয় চিন্তা করলেই খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি, এমন কিতাবের অনুবাদের জন্য বহু জনের সমন্বয়ে গঠিত অনুবাদক সম্পাদক ও নিরীক্ষক টিমের প্রয়োজন।

এর বদলে দাওয়াত, আকিদাহ-বিশ্বাস, ইসলামী ফিকহ, আদব-শিষ্টাচার বিষয়ে এমন অনেক কিতাব রয়েছে যেগুলো অনুবাদ করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া এবং সুলভ মূল্যে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেয়া অধিক উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ- আলহামদুলিল্লাহ!

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসীর রচনাবলীর ব্যাপারে

এবার আসি শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসীর রচনাবলী প্রসঙ্গে। এখানে আসলে আমি বুঝতে পারছি না প্রশ্নপত্রে শাইখের কোন কিতাবের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তবে একথা বলতে পারি, শাইখ আবু মুহাম্মদের সর্বশেষ কিতাবগুলোর মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর (অর্থাৎ ইমান, কুফর ও তাকফিরের উপর) অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গ্রন্থনা হচ্ছে الرسالة الثلاثينية.

আমি এ কিতাবটি পাঠ করার উপদেশ দিচ্ছি।

নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর

এবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে কথা। এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, এটি জায়েজ নয়। কারণ এতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে শক্তিশালী ও সমর্থন করা হয়। আর এই অংশগ্রহণ—যদিও সেটা বাহ্যিক ভাবেই হোক না কেন—এই কুফুরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণের ই নামান্তর। তাছাড়া তুর্কি বাস্তবতা ও এ জাতীয় অন্যান্য প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে অংশগ্রহণের দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে—কিংবা বলা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই—কাফের দলগুলোর মধ্যে থেকে কোন একটিকে শক্তিশালীকরণ অথবা কুফরী পার্লামেন্টের প্রধানমন্ত্রী বা কোন সদস্যকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

আর যেহেতু এই নির্বাচন সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্যই হয়ে থাকে, তাই এতে অংশগ্রহণ করে ভোট দেয়া এমন ব্যক্তিকে সমর্থনদান, নির্বাচন ও শক্তিশালীকরণের প্রকারান্তর, যে শিরকি মজলিসে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করে। আর নিসন্দেহে এমন কাজ কুফুরি।

অতএব নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়।

‘মন্দের ভালো’ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে

সমকালীন কতক আলেম গবেষণার জন্য নতুন আরেকটি মাসআলা বের করেছেন আর তা হচ্ছে:

দুজন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রয়েছে।

একজন এমন কোন দলের প্রার্থী যে দলকে ইসলামী দল হিসেবে গণ্য করা হয় অথবা সে এমন কোন জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী যে দল আল্লাহর দ্বীনের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে না, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি যাদের ঘৃণা তেমন তীব্র নয়, যারা দ্বীনদারদের প্রতি সদয়।

অপরপ্রার্থী একজন সেক্যুলার বা সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী, যে ইসলাম ও শরীয়তের প্রতি খোলামেলা শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, ইহুদি খ্রিস্টান ও অন্যান্য কাফের গোষ্ঠীর সঙ্গে যার রয়েছে আন্তরিক সম্পর্ক।

এই দুই প্রার্থীর মাঝে নির্বাচনী লড়াই হচ্ছে। এক্ষেত্রে কী হবে?

একইভাবে কাফের রাষ্ট্রগুলোতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থার ব্যাপারেও প্রশ্ন আসে। এখন এখানে মূল জিজ্ঞাসাটি হচ্ছে: ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে দল বা প্রার্থী তুলনামূলক কম ক্ষতিকর তাদেরকে ভোট দেয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ কি-না, যাতে তারা তুলনামূলক বড় অনিষ্ট প্রতিরোধ করতে পারে? যদিও মুসলমান সকলেই একথা ভালভাবে জানেন যে, এই প্রার্থীরা সকলেই কাফের। তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় দিয়ে বিচার ফয়সালা কখনোই করবেনা। মুসলমানদের প্রতি কখনই তারা সন্তুষ্ট হবে না এবং কোন অবস্থাতেই শাসক হিসাবে মুসলমানদেরকে তারা গ্রহণ করবে না। এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা একটি পক্ষকে এজন্যই ভোট দিবে, যাতে তুলনামূলক ছোট অনিষ্ট মেনে নিয়ে বড়টি প্রতিরোধ করা যায়।

এখন এ কাজ করা জায়েজ কি-না?

এই জিজ্ঞাসার সবচেয়ে সমুচিত ও সত্যঘনিষ্ঠ জবাব আমরা এটাই মনে করি যে, **এমন অবস্থায়ও মুসলমানদের জন্য ভোট দেয়া জায়েজ হবে না।**

কারণ এ বিষয়টি সুসাব্যস্ত যে, কাফেরকে ভোট দেয়ার দ্বারা তাকে সমর্থন করা হয় এবং তার দলের কুফুরি প্রোগ্রাম ও ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়। আর এটাই যদি ভোটদাতার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তা কুফর। এমতাবস্থায় বড় অনিষ্ট প্রতিরোধের এমন অজুহাত দেখিয়ে কোন কুফুরি কাজের দিকে পা বাড়ানো কিছুতেই জায়েজ নয়। তাছাড়া বড় অনিষ্ট প্রতিরোধের এই অজুহাতও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এটি একটি অনিশ্চিত বিষয়।

কথিত ইসলামী দলের মুসলিম দাবিদার প্রার্থীরা ক্ষমতায় গেলে আরো বড় অনিষ্ট সাধিত হবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে?

আবার ইসলামের জন্য অধিক ক্ষতিকারক ও খোলামেলাভাবে শরীয়তের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন পক্ষ জিতে গেলেও কখনো-সখনো পরিণতি বিচারে তা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। কারণ তখন মানুষকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা এবং চ্যালেঞ্জ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ তৈরী হয়ে যায়। জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্'র অনুকূলে জনমত তৈরিতে দায়ী ও মুজাহিদদের সামনে অনেক পথ খুলে যায়।

তবে উপরোক্ত অজুহাত ও ব্যাখ্যা যারা গ্রহণ করবে সর্বাবস্থায় তাদেরকে তাকফির করা যাবে না। আর এটাই আমার এই মাসআলা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

তাই যুবক মুজাহিদদের কর্তব্য হলো, এজাতীয় লোকদেরকে তাকফির করা থেকে বিরত থাকা। কারণ তারা এমনটি করলে গুনাগার হবেন। তাদের দ্বারা অনিষ্ট সাধন হবে। তারা ব্যর্থ হয়ে যাবেন এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়ার কারণ হবেন। কেবল যিনি ইলম হাসিল করেছেন এবং তাফাককুহ ফিদ্দীন (দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করা।) অর্জন করেছেন, তিনি মানুষের সামনে সত্য প্রকাশে, তাদেরকে বিশুদ্ধতার আহ্বান জানাতে এবং তাদের জন্য দ্বীনকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হতে পারেন। তৌফিক তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে।

তুরস্ক ও এমন অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার হুকুম

তুরস্ক ও এ জাতীয় অন্যান্য কাফের-মুরতাদ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার ব্যাপারে হুকুম হলো, এমনটা জায়েজ নয়। কারণ এরা তো মুরতাদ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। অতএব যে ব্যক্তি এদের অধীনে থাকবে এবং এদের একজন সৈনিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, সে কাফেরদের সৈন্যদের একজন বলে গণ্য হবে, কাফেরদের স্বার্থে তাকে প্রস্তুত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে। এমন ব্যক্তি কাফেরদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা ও সংবিধান রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

এ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব সেনাবাহিনীতে চাকরি করার দ্বারা মানব রচিত আইন-কানুনের সহায়তা ছাড়াও আরও বিভিন্ন কুফুরি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে হয়। এসব চাকরির দরুন বিভিন্ন গুনাহ, পাপাচার ও শরীয়ত গর্হিত কাজ করতে বাধ্য থাকতে হয়। কারণ সৈনিককে কুফুরি কথাবার্তা শুনতে হয়। এমনকি প্রায় ক্ষেত্রে তার নিজেরও কুফরি কাজ অথবা কুফুরি উক্তি করতে বাধ্য হতে হয়। যেমন অভিশপ্ত আতাতুর্কের মত কাফের তাগুত'দেরকে সম্মান জানাতে হয়। রাষ্ট্র তুরস্ক,

তার সংবিধান ও তার পতাকাকে স্যালুট করতে হয়। একে সাহায্য করার এবং এর জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করতে হয়। এমনই আরো বিভিন্ন কিছু।

অতএব এসব সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করা নাজায়েজ। বরং আসল কথা হলো এমনটা করা কুফরি নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক!

কিন্তু এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, সেনাবাহিনীতে চাকরি করা প্রতিটি ব্যক্তিকে আমরা তাকফির করব?

এর জবাব হল: সহজ স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আমরা এমনটা করবো না। বরং আমরা ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা বিবেচনা করব। এরপর রিদ্দা ও তাকফিরের মাসআলা সংক্রান্ত যে মূলনীতির কথা পূর্বে আলোচনা হয়েছে, তা অনুসরণ করে আমরা ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম দেব। কারণ বোঝাই যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর এই চাকরির ক্ষেত্রে লোকদের এমন কোন অপারগতা থাকতে পারে, যা তাদেরকে তাকফির করার পথে প্রতিবন্ধক।

যেমন: কেউ রাষ্ট্র ও শাসন কর্তৃপক্ষের কথা বিবেচনায় না নিয়ে এই ধারণা ও ব্যাখ্যা করে বসল যে, এই সেনাদল হচ্ছে এতদঞ্চল রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। পাশাপাশি সে এই দাবি করলো যে, নিজের দ্বীনকে হেফাজতের জন্যই সে ওখানে প্রবেশ করেছে! সে কোন কুফুরি অথবা গুনাহের কাজে অংশগ্রহণ করবে না কিংবা কেউ এই চাকরি নিল এবং সে জানে যে এটি মুরতাদ রাষ্ট্রের বাহিনী কিন্তু সে বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশ্যে সামরিক সক্ষমতা ও শক্তি উন্নয়নের ইচ্ছায় তাতে প্রবেশ করল। অথবা কোন জিহাদী উদ্দেশ্যে সে চাকরি নিল (আমরা এমন করার বৈধতা নিয়ে আলোচনায় এখন যাচ্ছি না)। অথবা এমন কেউ থাকতে পারে, যে শরিয়াসম্মত বাধ্যবাধকতার শিকার হয়ে অপারগ অবস্থায় এই চাকরি নিয়েছে। কিংবা কেউ ব্যাখ্যা করলো যে, সে শরিয়াসম্মত বাধ্যবাধকতার শিকার। আল্লাহু আ'লাম- তিনি সর্বজ্ঞ!

এখন কথা হচ্ছে, মুরতাদ কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই চলাকালে যখন আমরা আক্রমণোদ্যত থাকবো তখন তাদেরকে কিভাবে বিবেচনা করবো?

নিঃসন্দেহে তখন আমরা এসব বাহিনীকে মুরতাদ গণ্য করে উপযুক্ত সামরিক আচরণ করব। ইসলামী শরীয়তের বিরোধী শক্তি ধরে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আর ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা জানিনা তার এমন কোন অপারগতা আছে কিনা যা তার ব্যাপারে কুফুরীর হুকুম প্রয়োগে প্রতিবন্ধক, **তাই**

আমরা তাকে কাফের ধরে নেব এবং লড়াইয়ের সমস্ত হুকুম-আহকাম ও সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কাফের সুলভ আচরণ করব। যুদ্ধ চলাকালীন ওই অবস্থায় মূল অবস্থা হল, এসব বাহিনীকে মুরতাদ ধরে নিয়ে সেভাবে আচরণ করা। তবে ওই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যার ব্যাপারে আমাদের জানা থাকবে যে, তাদের মাঝে থাকা সত্ত্বেও তার গ্রহণযোগ্য অপারগতা রয়েছে। তবে অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জানাশোনার আলোকে বলা যায়, এমনটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

সেনাবাহিনীগুলো কি দলগতভাবে মুরতাদ নাকি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলে মুরতাদ?

এই গেল একটি আলোচনা। পাশাপাশি এখানে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই বহুল আলোচিত একটি মাসআলার ব্যাপারে। বিভিন্নভাবে এই মাসআলাটি আলোচনায় এসেছে এবং এ নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এ-সংক্রান্ত অনেক গবেষণা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সামনে এসেছে। সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে কিছু আছে আসলেই এমন উপকারী, যার দ্বারা মূলগত হুকুম জানাটা সহজ হয়। আবার এমন আলোচনাও আছে, যেগুলো কেবল-ই তর্কাতর্কি ও চর্বিত চর্বণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলোর দ্বারা কাজের চাইতে কথা বেশি বলার দ্বার উন্মুক্ত হয় এই যা। তবে আমরা ভালো করেই জানি, প্রায় সময় যুবক মুজাহিদদের মাঝে কোন বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা-পর্যালোচনা চলতে থাকে অবিরামভাবে। তা হচ্ছে এই প্রশ্নটি,

এসব দল শুধু দলগতভাবে মুরতাদ না-কি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলেই মুরতাদ?

যেহেতু এখানে আমাদের আলোচনা জিহাদের হুকুম-আহকামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই আমরা এসব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে পড়ে থাকার মাঝে খুব একটা ফায়দা দেখিনা। এখন চাই দলগতভাবে তারা মুরতাদ হোক কিংবা ব্যক্তিপর্যায়ে সকলে মুরতাদ হোক-তাতে কিছু আসে যায় না; আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু

নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী নই। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ চলাকালে এবং সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব বাহিনীর সঙ্গে মুরতাদদের ন্যায় আচরণ করা হবে। সংক্ষেপে এটুকু আলোচনাই এখানে প্রাসঙ্গিক। আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ!

তুর্কি জনগণের ব্যাপারে

আমরা সামগ্রিকভাবে অন্য সব মুসলিম জনসাধারণের মতই তুর্কি জনসাধারণকে বিবেচনা করি। আমরা কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে এ বাক্য ব্যবহার করি: "মুসলিম তুর্কি জাতি" ইত্যাদি। তারা আমাদের দৃষ্টিতে অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর মতই। আমাদের এমন অবস্থান আসল ও প্রধান অবস্থার বিবেচনায়। কারণ কোন সন্দেহ নেই, তুর্কি জনসাধারণের মূল অবস্থান—তারা মুসলমানের সন্তান মুসলমান। তারা বেড়ে ওঠার সময় কাল থেকেই ইসলামের বাণী কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে এবং সর্বদা এর উপরেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ইসলামকে নিজেদের ধর্ম হিসেবে স্বীকার করে।

আর অধিকাংশের বিবেচনায় 'মুসলিম তুর্কি জাতি' বলার যৌক্তিকতা হলো, আমরা মনে করি অধিকাংশ তুর্কি নাগরিক আল্লাহর রহমতে সত্যিকার অর্থে মুসলমান। যদিও আর্মেনিয়া সহ অন্যান্য বিভিন্ন খ্রিস্টান, ইহুদি, জিন্দিকদের মত মূলগত কাফেররা, দ্বীন থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত প্রগতিশীল মুক্তমনা নাস্তিক গোষ্ঠী ও সেক্যুলারদের মত মুরতাদরা, মুসলিম দাবিদার আরো বিভিন্ন কাফের গোষ্ঠী যেমন নুসাইরিরা, কবর পুজারী কট্টর সুফিরা এবং দ্বীন বিকৃতকারী মুলহিদ গোষ্ঠীসহ এ জাতীয় আরো অনেক গোষ্ঠী তুর্কি জাতিসত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তথাপি শহরে-বন্দরে, গ্রামেগঞ্জে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ তুর্কি নাগরিক জনসাধারণ যারা অন্যদের তুলনায় সংখ্যায় সবচেয়ে বড়—তারা ইসলামকে বুকে ধারণ করে সহিসালামতে ঈমানের বেষ্টনীতে টিকে আছে। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ!

যদি ধরা হয়, মুসলমানদের অংশটি সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তবুও কখনো এটা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় হবে না যে, আমরা নিখুঁত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এমন ফলাফল বের করে আনব, যার দ্বারা কাফেরদের সংখ্যা ও জনবল অধিক দেখা যাবে। বরং আমরা মূলগত অবস্থা ও স্বাভাবিক প্রাধান্য বিবেচনার যে মূলনীতি আলোচনা করেছি, তা অনুসরণ করে বাহ্যিক অবস্থায়ই ক্ষান্ত দেব। পাশাপাশি

আরও একটি কারণ হচ্ছে, আমরা সুলক্ষণ গ্রহণ করতে চাই। এছাড়াও সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনা থাকলেও 'তুর্কি মুসলিম জাতি' কথাটাকে তার অতীত ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক প্রমাণ করা সম্ভব। অতএব ভাষাগত দিক থেকেও থেকে এটি আপত্তিকর নয়। আর রাজনীতির জন্যেও এমনটি বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ এবং নির্ভুল ফায়সালা দাতা! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম!

তুরস্কের উলামায়ে কেরাম ও জনগণের প্রতি নসীহত

এরপর আপনারা জানতে চেয়েছেন: তুরস্কের আলেম-ওলামা ও জনসাধারণের প্রতি আমাদের নসীহত কী?

এর উত্তরে আমরা বলব: নিশ্চয়ই আমরা উলামায়ে কেরামকে তাদের দায়িত্ব পালনের উপদেশ দিই। আল্লাহ তা'আলাই তো তাদেরকে এ আদেশ দিয়ে এরশাদ করেছেন:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَه

তরজমা: (আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না) [সূরা আলে ইমরান: ১৮৭)

আমরা তাদেরকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করছি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

তরজমা: হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের

নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (সূরা আত তাওবা: ৩৪)

তাদের প্রতি নসীহত হলো, তারা যেন উপলব্ধি করেন যে, মানুষ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে; যদি তারা সরল পথে থাকেন তাহলে মানুষ সরল পথে থাকবে আর যদি তারা বিপথে চলে যান তাহলে মানুষও বিপথে চলে যাবে। নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় আমানত। অতএব তাঁরা যেন ইলম, দাওয়াত, বক্তৃতা, লেখনি—সব কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। সত্য এবং সত্যপন্থীদেরকে তারা যেন সাহায্য করেন। আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় যেন তারা না করেন। ইলমের পথে থাকা প্রত্যেকেরই স্মরণে রাখা উচিত, আলেমদের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। শরীয়তের প্রমাণাদি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এমনটাই আমরা দেখতে পাই।

একপ্রকার আলেম হচ্ছেন যারা আল্লাহর দ্বীন ও আখেরাতের পক্ষে। তাঁরা আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদানকে প্রাধান্য দেন। আল্লাহর ভয় তাঁদেরকে খারাপ কাজ করতে বারণ করে। তাঁদের ইলম আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরাই সফল ও সৌভাগ্যবান। আল্লাহর সঙ্গে তাঁদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাঁরা আল্লাহকে সাহায্যকারী এবং তাঁর কাছে থাকা প্রতিদানের ব্যাপারে আশাবাদী।

আরেকদল দুনিয়াদার ওলামা। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, নিজেদের ইলমের মাধ্যমে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। তারা দুনিয়াবী লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য ইলম ও দ্বীনকে ব্যবহার করে। ধন-সম্পদ উপার্জন, সুস্বাদু আহার্য ও পানীয়, দামি বাসস্থান ও মূল্যবান পোশাক ইত্যাদির ভেতর ডুবে থাকে তারা। কিংবা উচ্চতর পদ-পদবী লাভ করে জমিনের বুকে অহংকারী হিসেবে বেঁচে থাকে তারা।

এই দ্বিতীয় প্রকারের আলেমের সংখ্যাই বেশি। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে সন্তুষ্ট করা, তাদের প্রিয়ভাজন হওয়া এবং প্রসিদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করা। তাই ওলামায়ে কেরামের প্রতি আমার নসিহা হলো, তাঁরা যেন সাফল্যের অধিকারী প্রথম প্রকারের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হতে সচেষ্ট থাকেন। ক্ষণস্থায়ী এসব ভোগ্য সামগ্রীর ওপর তাঁরা যেন আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদানকে প্রাধান্য দেন।

আর তুর্কি জনসাধারণের প্রতি আমাদের নসিহত হলো, তারা যেন এ কথা স্মরণ রাখেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। অকারণে তিনি তাদেরকে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেননি। নিঃসন্দেহে তাদের কাঁধে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চেপে আছে। সে দায়িত্বের ব্যাপারে তারা জিজ্ঞাসিত হবেন। অতএব তারা যেন একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেন এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগীর উপর অটল অবিচল থাকেন। তারা যেন এ কথা স্মরণ রাখেন, যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, প্রতিটি বান্দা একাকী তার রবের কাছে উপস্থিত হবে, কেয়ামতের বিভীষিকাময় সেদিনে কেউই একথা বলে পার পাবে না যে, আমি অমুক বড় ব্যক্তি কে অনুসরণ করেছি! আমি অমুক সরদারের অনুগামী হয়েছি! আমি অমুক নেতার, অমুক শাইখের...আমি আমার পিতৃকুলের পথে চলেছি! উদ্ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত এবং পথের পথিক হয়ে গেলে কেয়ামতের দিন এজাতীয় অজুহাত কাজে আসবেনা। কারণ আল্লাহ তাআলা রাসূলের মাধ্যমে, দ্বীন ইসলামের মাধ্যমে, কোরআনের মাধ্যমে মানুষের জন্য তার দলিলকে পূর্ণতা দান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সৃষ্টিকুলের জন্য অজুহাত দেখানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

অতএব মুসলিম জনসাধারণ যেন ইলমে দ্বীন অর্জন করে, কোরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা সত্যবাদী সৎকর্মশীল লোকদেরকে অনুসরণ করে এবং তাদের সঙ্গ গ্রহণ করে। তারা যেন আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা সম্পর্কে, তাঁর হুকুম আহকাম সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করে এবং দ্বীনী জ্ঞান ও ফিকহী জ্ঞান অর্জন করে। সর্বোপরি তারা যেন আল্লাহর, আল্লাহর দ্বীনের এবং আল্লাহ ভীরু দ্বীনদার মুসলমানদের সাহায্যকারী হয়ে যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুর্কি জাতি এমন এক মহান জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তারা যখন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাদেরকে বরকতময় করেছেন। অতএব তাদের সেই হৃতগৌরব তখনই পুনরুদ্ধার লাভ করবে, যখন তারা নতুন করে ইসলামের পথে ফিরে এসে ইসলামকে পুরোপুরি ভাবে আঁকড়ে ধরবে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের কোলে প্রতিপালিত হয়ে কিছুতেই তারা নিজেদের সম্মান ফিরিয়ে আনতে পারবে না। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাকার কুফুরী মতবাদ অনুসরণ করে কখনোই তারা সফল হতে পারবে না। কারণ সকল মতবাদ একপাশে আর ইসলাম যা কিনা

আল্লাহর দ্বীন; যা হলো স্বাধীনতার, সম্মানের, গৌরবের, মর্যাদার, ইহকালীন সৌভাগ্যের এবং পরকালীন সাফল্যের ধর্ম, সেটি অন্যপাশে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাকে চান তাকে সীরাতে মুস্তাকিমের দিকে হেদায়েত করেন।

শাইখ আল-মাকদিসীর বক্তব্যের ব্যাপারে মন্তব্য

তুর্কি ভাইদের আরেকটি জিজ্ঞাসা: শাইখ আবু মুহাম্মদ মাকদিসী হাফিযাহুল্লাহ্'র সেই বক্তব্য যা তিনি الرسالة الثلاثينية গ্রন্থে এনেছেন; যে বক্তব্যের দ্বারা তিনি তাকফিরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণকে তাকফিরের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন—শাইখের সেই বক্তব্যকে আপনারা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

শাইখের বক্তব্য: *“এ কারণে হুজ্জত কায়েম করার আগে এবং সংসদ সদস্যদের কাজের প্রকৃতি এবং এগুলো যে দ্বীন ইসলাম ও রাব্বুল আলামিনের তাওহিদের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক, এ বিষয়গুলো তাদেরকে জানানোর আগে তাদেরকে তাকফির করা হালাল হবে না। এরপরেও যদি তারা তাদেরকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে অনড় থাকে তখন তাদেরকে তাকফির করা হবে।”*

শাইখের এমন বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা বলবো, আমরা সর্বতোভাবে এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত এবং একে আমরা যথার্থ বলে মনে করি। **তবে এটা সাধারণ অবস্থায়; কোন বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে।** এখন কথা হল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তির উপর যদি হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; যদি কখনো এমনটা বলা যায় যে, তার উপর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সংশয় নিরসন হয়েছে, এখন এজাতীয় ব্যক্তি আদতেই তাকে শোনানো এ সংক্রান্ত আলোচনা বুঝতে ও অনুধাবন করতে পেরেছে কি-না, সেটি নির্ণয়ের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান এবং যারপরনাই যাচাই-বাছাই প্রয়োজন।

এমন যেন না হয়, কেউ শুধু দাবি করে বসলো যে, অমুক অমুক ব্যক্তির উপর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কারণ সে সবকিছু উপেক্ষা করে অহংকারবশত দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে; এরপর সে দাবির ওপর ভিত্তি করে কাউকে তাড়াহুড়া করে তাকফির করে দেয়া হলো! কারণ এগুলো অপরিণামদর্শিতা ও আবেগের তাড়না

ছাড়া আর কিছুই নয়—বিশেষত এই স্পর্শকাতর মাসআলায়। কারণ পরিস্থিতি আজ এতটাই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেক আলেমই অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা জায়েজ এমনকি ওয়াজিব পর্যন্ত বলেছেন। এ বিষয়গুলো সর্বত্র প্রসিদ্ধ; আমরা সকলেই জানি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর!

উপসংহার

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে কামনা করি, যেন তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের সকল ভাইকে সব রকম কল্যাণ দান করেন, মুসলমানদের জন্য সম্মানের এমন মাইলফলক সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে দেন, যা তার অনুগত ইবাদতকারী বান্দাদেরকে গৌরবের পথে পরিচালিত করবে; যা পাপিষ্ঠদেরকে অপদস্থ করবে এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দিকে পথ নির্দেশ করবে।

আগে-পরের সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য!

আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ- এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর।

লিখেছেন—

আতিয়াতুল্লাহ

শাবান ১৪৩২ হিজরী
আস সাহাব মিডিয়া ফাউন্ডেশন